বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী।

বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগতি হইল যে, ঋগ্বেদের সময় হইতে আর্য্য জাতির মধ্যে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিধি পূর্ব্বক উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত কি না, ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্য্য জাতির সকল সম্প্রদায়েরই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, হিন্দুশাস্ত্র মতে অবিবাহিত পুরুষের ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার নাই। বিবাহিত পুরুষেরও সন্তান না হইলে, পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না, এবং যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পুৎনামক নরকে বাস করিতে হয়। এই কারণ বশতঃ, পুরুষ মাত্রেরই শাস্ত্র সম্মত দার পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহের আট প্রকার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ।

প্রথম, ব্রাহ্ম বিবাহ—এই বিবাহে সালঙ্কৃতা কন্যাকে বসনাচ্ছাদিত করিয়া বেদবেত্তাকে আহ্বান ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক দান করিতে হয়।

দ্বিতীয়, দৈব বিবাহ—এই বিবাহে যজ্ঞবৃত ঋত্বিক্‌কে যজ্ঞ সম্পাদন কালে কন্যা দান করিতে হয়।

তৃতীয়, আর্য বিবাহ—এই বিবাহে [illegible] নিকট হইতে এক বার মাত্র দুইটি গো মিথুন গ্রহণ করিয়া যথা বিধি কন্যাদান করিতে হয়।

চতুর্থ, প্রাজাপত্য বিবাহ—'উভয়ে ধর্ম্ম কর'—এই বলিয়া কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

পঞ্চম, আসুর বিবাহ—ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করার নাম আসুর বিবাহ।

ষষ্ঠ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের অজ্ঞাতসারে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরের যে পাণি গ্রহণ করে, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

সপ্তম, রাক্ষস বিবাহ—কন্যার পিত্রাদিকে হত বা আহত করিয়া রোদন পরায়ণা কন্যাকে বল পূর্ব্বক হরণ করার নাম রাক্ষস বিবাহ।

অষ্টম, পৈশাচ বিবাহ—কন্যা সুপ্তা, মত্তা বা প্রমত্তা অবস্থায় থাকিলে, গোপনে ঐ কন্যার পাণি গ্রহণের নাম পৈশাচ বিবাহ।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত আছে। পৈশাচ বিবাহ কাহারও পক্ষে বিহিত নাই, শাস্ত্রকারেরা এই রূপ বিবাহ করিতে পদে পদে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নিকৃষ্ট বর্ণেরা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিবাহ করিতে পারেন, ইহাও বিহিত আছে; কিন্তু পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকৃষ্ট প্রণালীতে বিবাহ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে উপলব্ধি হয় যে, মনুর লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রণালীর দুই চারিটি আর্য্য জাতির মধ্যে বহু কালা-

বধি প্রচলিত ছিল ; কেননা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বাপর যুগের পরিশিষ্টাংশেও ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিতেন। মহাভারতীয় আদি পর্ব্বে লিখিত আছে, কুরুকুল চূড়ামণি ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাত্রয়কে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া প্রথমোক্ত দুই জনের আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকেও রাক্ষস বিধানে বিবাহ করেন। যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে, ও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর প্রভৃতি বিবাহ প্রণালী মনুর অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রণালীর মধ্যে লিখিত হয় নাই ; তথাপি, আর্য্য জাতির মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। দময়ন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে মহতী স্বয়ম্বর সভা সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে, দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নল রাজাকে উপযুক্ত স্বামী মনোনীত করিয়া তাঁহার গলদেশে স্ব ইচ্ছায় বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, ও অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রুপদ তনয়া যাজ্ঞসেনীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ম্বর, লক্ষ্যভেদ এবং ধনুর্ভঙ্গ দ্বারা যে সকল রাজ দুহিতারা উপযুক্ত পতি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা আজন্ম কাল সেই মনোমত পতি লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এক্ষণকার কালে পূর্ব্ব কথিত বিবাহ প্রণালী একেবারে লোপাপত্তি পাইয়া গিয়াছে। আর্য্য বংশীয়া অবিবাহিতা কন্যারা আর পতি মনোনীত করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না। পিতা মাতা এবং ভ্রাতৃগণে যে সকল বর মনোনীত করিয়া দিবেন, দুঃশীলই হউক, আর সুশীলই হউক, তাহাই তাঁহাদিগকে শির অবনত করিয়া গ্রহণ করিতে

হইবে। কি আশ্চর্য্য কথা! আজন্ম কাল যাহাকে লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যে পতি স্ত্রীলোকের এক মাত্র সুখের স্থল, বিবাহের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও আর্য্য জাতির কন্যারা সেই পতির মুখাবলোকন করিতে পান না; একেবারে স্ত্রী আচারের সময় পতি পত্নীর দর্শন লাভ হয়। এরূপ ঘটিতে পারে যে, শুভ দৃষ্টির সময়ে কন্যা পতির আকার প্রকার দর্শনে একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। লজ্জা ও গুরুজনের ভয়ে তিনি সে মনোগত ভাব মনোমধ্যেই যাপ্য করিয়া রাখেন; কিন্তু বয়স্থা হইলে, কার্য্য গতিকে পতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। অনেক স্থলে, পতিও স্ত্রী আচারের সময় পত্নীকে দর্শন করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। হয়ত, এরূপ ভাবিলেও ভাবিতে পারেন যে, পিতা আমার ধন লুব্ধ হইয়া এই কুরূপা কামিনীর সহিত বিবাহ দিলেন। এতদ্দ্বারা আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কেননা, আমি উপার্জ্জনক্ষম হইলে, আপনি দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিব; তথাপি, এ কুৎসিতা পত্নীকে লইয়া কোনও ক্রমেই আজীবন কাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না। পত্নীর পতি মনোনীত ও পতির পত্নী মনোনীত করিবার প্রথা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাওয়া, ব্যভিচার ঘটিবার একটি প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডে দম্পতীরা বিবাহের দীর্ঘ কাল পূর্ব্বে পরস্পরের রীতি, নীতি, ব্যবহার ও রূপ গুণের বিষয় বিশিষ্ট বিধানে অবগত হইবার জন্য ভাবী পতি বা পত্নীর বাটীতে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন, এবং লিপিযোগে পরস্পরের মনোগত ভাব পর-

স্পরকে অবগত করান। যখন উভয়ে উভয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট হন, তখন পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের অনুমতি লইয়া দেশাচার অনুযায়ী বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। যদিও তাঁহারা এত দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তথাপি, প্রতি বৎসর তত্রত্য প্রধান প্রধান বিচারালয়ে পতি পত্নী পরিত্যাগের শত শত আবেদন উপস্থিত হইয়া থাকে।

এদেশীয় যোষাগণের ন্যায় পতিপরায়ণা পৃথিবীর খণ্ড চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও দেশে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরাই পতিকে দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীনেরা কুলমর্য্যাদায় মত্ত হইয়া আপন আপন দুহিতৃগণের উপর অত্যাচারের একশেষ করিয়া গিয়াছেন, এবং এক্ষণেও তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ক্ষান্ত হন নাই। ব্রাহ্মণ কুলীনের সংখ্যা প্রথমতঃ অতি অল্পই ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ সমাজ আবার চারি মেলে বিভক্ত; যথা—ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী। মেল ছাড়া হইয়া অন্য মেলে কেহ কন্যা দান করিতে পারেন না; এই জন্য, কন্যাদান করিবার সময় পাত্রের অভাব হইয়া পড়ে। অনুমানে বোধ হয়, এবং কার্য্য গতিকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক; কন্যাদান করিবার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করণ কালে এইটি বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। কুলীন ব্রাহ্মণের মুখে শুনা যায় যে, কেবল পাত্রের অভাব জন্যই তাঁহারা এক পাত্রে বহুসংখ্য কন্যাদান করিতে বাধ্য হন। সময়ে সময়ে এত দূর ঘটিয়া উঠে যে, অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পরমা সুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যার বিবাহ হয়। শাস্ত্রে লিখিত

আছে যে, পতি সেবাই স্ত্রীলোকের এক মাত্র ধর্ম্ম; এই জন্য, কুলীন কন্যারা কেবল পরকাল রক্ষার জন্য কুরূপ, মূর্খ ও বৃদ্ধ পতির প্রতিও এক দিনের জন্য অভক্তি করিতেন না। অবশেষে, মৃত পতির সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার জীবন্ত শরীর দগ্ধ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া যাইতেন।

ব্রাহ্মণ জাতির কন্যাগত কুল; এই জন্য, তাঁহারা কন্যা সন্তানের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া আপনাদিগের কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। কায়স্থ জাতির পুত্রগত কুল; জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত অগ্রে কুলীন কন্যার বিবাহ দিতে হয়, তাহার পর, সেই পাত্র পুনর্ব্বার মৌলিক কায়স্থের ঘরে বিবাহ করিয়া থাকে। ধনবান্ মৌলিক কায়স্থেরা আপনাদিগের কুলের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কুলীন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কায়স্থ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রে কুলীন কন্যাকে বিবাহ না করিয়া মৌলিক কায়স্থের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন না; এই জন্য, বিপুল ধনের পতি মৌলিক কায়স্থেরা পূর্ব্ব হইতেই একটি কুলীন পুত্রকে মনোনীত করিয়া রাখেন। উপযুক্ত সময়ে কুলীন কন্যার সহিত সেই ভাবী জামাতার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেন। জামাতার পিতা ব্যয় বাহুল্য হেতু যদি সে কার্য্যে অক্ষম হন, তাহা হইলে, মৌলিক ধনবান্ কায়স্থ ভাবী জামাতার কুল-কার্য্যের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা আপনারা দিয়া সে পাত্রটিকে হস্তগত করিয়া রাখেন; তাহার পর, আপনার কন্যার সহিত সেই কুলীন পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করান। একপ বিবাহের নাম 'আদ্যরস'।

আদ্যরস প্রিয় ধনাঢ্য কায়স্থের কন্যাগণ যদিও সপত্নীর উপর

পরিণীতা হন, তথাপি,সপত্নীর জন্য তাঁহাদিগকে কোনও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; কারণ, তাঁহাদিগের পতিরা ধনবানের জামাতা হইয়া খাওয়া পরার সুখের জন্য শ্বশুরালয়েই পড়িয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে হতভাগিনীদিগকে বিবাহ করিয়া আপনাদিগের কুল রক্ষা করিয়াছিলেন, উন্নত অট্টালিকার উপর বাস করিয়া আর সে কুটীর বাসিনী দরিদ্র কন্যাগণকে এক বারও স্মরণ করিতে অবসর প্রাপ্ত হন না। বড় মানুষের জামাতা হইয়া শ্বশুরালয়ে বাস করায় যে কত দূর সুখোৎপত্তি হয়, এবং সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক গৃহজামাতার যে কত দূর সেবা ভক্তি হইয়া থাকে, মৃত কবি দীনবন্ধু মিত্রজ মহাশয় স্বপ্রণীত 'জামাই বারিক' প্রহসনে তাহা বিস্তারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মিত্রজ মহাশয় কেবল কায়স্থ কুলীন পুত্র লইয়াই আপনার 'জামাই বারিক' গঠন করিয়াছেন, সে বারিকে ব্রাহ্মণ কুলীন পুত্র স্থান প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল, ও কায়স্থের পুত্রগত কুল; এই জন্য, কায়স্থ কুলীনদিগের পুত্র সন্তানেরা ও ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের কন্যা সন্তানেরা আপন আপন পিতৃগণের কুল মর্য্যাদা বাড়াইতে গিয়া আজীবন কাল দুর্ব্বিষহ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের কুলই এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কায়স্থ কুলীন কুমারেরা ধনাঢ্য শ্বশুরের আলয়ে থাকিয়া আপন আপন পত্নী কর্ত্তৃক যেরূপ উৎপীড়িত হন, ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যাদিগের উপর পতির উৎপীড়ন তাহা অপেক্ষা শত গুণ বলিয়া ধরিতে হয়। ব্রাহ্মণ কুলীনেরা এক কুল রক্ষার অনুরোধে ধর্ম্ম শাস্ত্রের মস্তকে মুদ্গারাঘাত করিয়া থাকেন।

কুলীন কুমারীদিগের উদ্বাহের দিন নাই, ক্ষণ নাই; অধিক কি, সময়ে সময়ে পুরোহিত পর্য্যন্তও যুটিয়া উঠেন না। পাত্র পাই-লেই কুলীন মহাশয়েরা বৃষোৎসর্গের বৎসতরী দানের মত এক এক পাত্রে চারি পাঁচটি করিয়া কন্যা সম্প্রাদন করিয়া থাকেন। কুশণ্ডিকা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে সে কুশণ্ডিকা যাগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। বর পাত্র রজনীতে চারি পাঁচটি যুবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রত্যূষেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করেন, পুনর্ব্বার আর সে বাটীতে পদার্পণ হয় কি না সন্দেহ। যদিও পুরা কালে বহু বিবাহের প্রথা এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, তথাপি, সে বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে,— স্ত্রী মদ্যপায়িণী, দুশ্চরিত্রা, প্রতিকূলা, চির ব্যাধিযুক্তা, অর্থ-নাশিনী, মৃতবৎসা, বন্ধ্যা, এবং কন্যা মাত্র প্রসবিনী না হইলে, পতি ভার্য্যান্তর গ্রহন করিতে পারিবেন না। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, আট বৎসর; মৃতবৎসা হইলে, দশ বৎসর; কেবল কন্যা মাত্র প্রসবিনী হইলে, এগার বৎসর অপেক্ষা করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্য অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত। স্ত্রী চির রোগিণী হইয়া যদি সুশীলা ও পতিহিতে অনুরক্ত থাকেন, তাহা হইলে, সেই স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। পরাশরসংহিতার মতে স্ত্রীদিগেরও পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এই ব্যবস্থা কি পুরা কালে, কি এক্ষণে অনেকে মান্য করিয়া চলেন নাই, ও চলিতেছেন না; এই জন্য বলিতেছি যে, এক্ষণকার

আর্য্য সন্তানেরা শাস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহারকেই সমধিক মান্য করিয়া চলেন। পিতৃগৃহে কন্যা রজস্বলা হইলে, কন্যার পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নরক গামী হইতে হয়, শাস্ত্রের এরূপ বিধান সত্ত্বে এদেশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন পুত্রেরা কেবল পাত্রের অভাবে উপযুক্ত সময়ে কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। শাস্ত্রানুসারে নরক গামী হইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি, বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা পরিত্যাগে স্বীকৃত হইবেন না।

প্রাচীন কালে এদেশীয় ভূপালগণ বহুসংখ্য দার পরিগ্রহ করিতেন; তাহার পর মুসলমান বাদশাহেরাও আপনাদিগের অন্তঃপুর স্বরূপা রমণীতে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। নবাব সুবাব পক্ষে বহু বিবাহ তত দোষাকর বলিয়া গণ্য হইত না; কিন্তু মধ্যবিধ লোকেরা বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন না। কেবল বল্লাল সেন মূর্খ, দুঃশীল, নিঃস্ব, কুলীন কুমারগণকে বহুসংখ্য দার পরিগ্রহ করিবার ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন। মধ্যে কিছু কাল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের বিবাহ করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। অর্থের প্রয়োজন হইলেই, কুলীন পুত্রেরা দুই একটি বিবাহ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতেন। সেই সকল নরাধমগণকে কন্যাদান করিতে ব্রাহ্মণ কুলীনেরা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না; বরং আপনাদিগকে কৃতী কৃতার্থ বোধ করিতেন। যে সকল কুলীন পুত্রেরা কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া যৌবন অবস্থায় বিবাহ করিতেন, কালে তাঁহাদেরই আবার দুই পাঁচটি কন্যা সন্তান হইলে, দুর্দ্দশার আর অবধি থাকিত না। জাতি গেল, কুল গেল, এই কথা বলিয়া ধনাঢ্য লোকেদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা

করিয়া বেড়াইতেন। একটি মাত্র পাত্র পাইলে, কতক প্রকাশ্যে, কতক বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া সেই এক পাত্রকে সমস্ত কন্যাগুলি উৎসর্গ করিয়া দিতেন। যাঁহারা কুলীন কন্যাদিগের পরিণয় কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে নিম্ন লিখিত শোচনীয় গল্পটি শ্রবণ করিয়াছিলাম ;—

বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলে বেলগড়িয়া গ্রামে বহুসংখ্য কুলীনের বাস ছিল। উক্ত গ্রামে রামনিধি মুখোপাধ্যায় নামক এক জন মহামহোপাধ্যায় কুলীন বাস করিতেন। তিনি স্বকৃত ভঙ্গ, ফুলের মুখটী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। ভাঙ্গা কুলীনের দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মহাসম্মান বৃদ্ধি হইয়া উঠে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগের বাটীতে কুলভঙ্গ করিয়া নগদ নয় শত পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার পিতার নিকটে যখন ঘটক আসিয়া গোস্বামীদিগের বাটীতে কুলভঙ্গের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,— ‘কুল ভাঙ্তে হলে, আমি ন’শ পঞ্চাশ টাকা ল’ব !’ এতদ্দ্বারা অনুভব হয় যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে, নয় শত পঞ্চাশ টাকা তাঁহার বাটীতে পাঁচটা বলদেও বহিয়া আনিতে পারিবে না। সে যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয়েরা সেই নয় শত পঞ্চাশ টাকা দিয়াই রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের কুলভঙ্গ করেন। তাহার পর, তিনি পর্য্যায় ক্রমে সাতাশটি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সাতাশটি স্ত্রীর মধ্যে পাঁচ ছয়টি স্ত্রীর গর্ভে সাত আটটি কন্যা জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি, মুখোপাধ্যায় সে কন্যাটিকে পাত্রস্থা করিতে পারেন নাই। অবশেষে, বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে ত্রয়ো-

দশ বর্ষীয় একটি বালককে এক প্রকার প্রতারণা করিয়া আপনার বাটীতে আনয়ন করেন। সে বালকটির কেহ অভিভাবক ছিল না; এই জন্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার বিষয় বিভব যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তৎসমুদায় তোমাকে দিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিব, তুমি আমার দুইটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা কর। এই রূপ কথাবার্ত্তার পর, পাত্র মুখোপাধ্যায়ের দুই কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া ভাবী শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন; ইত্যবসরে মুখোপাধ্যায়ের যেখানে যে কয়েকটি কন্যা ছিল, সকলগুলিকে তিনি আপন বাটীতে আনাইলেন। সেই কন্যাগুলির মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার নয় মাস মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বৎসর, কনিষ্ঠার নয় মাস মাত্র, মধ্য স্থলে বিংশতি হইতে সপ্তম অষ্টম বর্ষীয়া আরও ছয় সাতটি কন্যাকে গন্ধাধিবাস করাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় রজনীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তৎপরে শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, বাটীর দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখোপাধ্যায় এবং পুরোহিত ঠাকুর দুইটি বর্ষীয়সী কন্যাকে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া অবশিষ্টগুলিকে তাহাদিগের পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। সকলের পশ্চাতে কিঞ্চিৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে সেই নয় মাস বয়স্কা কন্যার জননী তাঁহার সেই এক মাত্র দুহিতাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই দুগ্ধপোষ্যা কন্যার সেই রজনীতে যে বিবাহ হইবে, তাহা তিনি তৎকালেও জানিতে পারেন নাই। অবশেষে, 'বরায় সম্প্রদদে' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া যখন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক কন্যাকে সিন্দূর পরাইয়া দিলেন, তখন সেই দুগ্ধপোষ্যা কন্যার জননী চীৎকার শব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। পাত্রও জানিতে পারিলেন যে, মুখোপাধ্যায় দুইটি কন্যার বিবাহ দিব বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক আটটি কন্যার বিবাহ দিলেন। 'আমি প্রত্যেক মাথা এক এক শত টাকা করিয়া লইব; নতুবা, এ বিবাহ স্বীকার করিব না'—এই কথা পাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলে, মুখোপাধ্যায়ও কিঞ্চিৎ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন,—আরে যাও হে বাপু! তোমার মাএর বিবাহও এই রূপ করিয়া হইয়াছিল; কুলীনের কাণ্ড কারখানা আমার আর কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণে ত আমি কুলরক্ষা করিলাম, তাহার পর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।

বঙ্গীয় মহিলাগণের এই রূপ দুর্দ্দশার বিষয় এক্ষণকার সভ্য সংসারের সুলেখকগণ বহুকালাবধি লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ, মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেই জন্য, কুলীন কন্যাদিগের দুর্দ্দশার বিষয় এ স্থলে বাহুল্য রূপে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; তবে ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যাদিগের অবস্থার বিষয় যেরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, বংশজ ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের কথাও সেই রূপ দুই একটি উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

শাস্ত্রে এবং পিতা মাতার স্নেহের নিকট কন্যা পুত্রে কিছুই প্রভেদ নাই; কিন্তু সমাজের দোষে আমাদিগের দেশের লোকে পুত্রের ন্যায় কন্যার প্রতি সমধিক স্নেহ মমতা করেন না। মনু লিখিয়াছেন,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

কন্যাকে রীতিমত পালন করিবে, ও অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। তাহার পর, ধন রত্ন দিয়া বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিবে।

কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যারা জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতা মাতার চক্ষের শূল হইয়া পড়েন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পিতা মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন,—যদি এ কন্যাটি সূতিকাগারেই পঞ্চত্ব পায়,তাহা হইলে, আপদ্ মিটিয়া যায়। আমি মহারথী কুলীন, আমার কন্যাকে বিবাহ করে, এরূপ পাত্র কোথায় পাইব? কিম্বদন্তী আছে যে, কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই রাজপুতেরা সূতিকাগারে মারিয়া ফেলিত। ব্রাহ্মণ কুলীনেরা কন্যাগুলিকে স্বহস্তে মারিয়া ফেলিয়াছে, এ পর্য্যন্ত এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু অযত্নে কত শত কুলীন কন্যা অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে। মোটামুটি বুঝিতে গেলে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—কুলীন এবং বংশজ। এক দিকে কুলীনেরা ইচ্ছা করিলেই শতাধিক বিবাহ করিতে পারেন, অন্য দিকে, বংশজেরা প্রায় অবিবাহিতাবস্থাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। যে সকল বংশজেরা আপনার ভিটে বিক্রয় করিয়া বংশ রক্ষার জন্য বহু কষ্টে একটি দার পরিগ্রহ করেন, সৌভাগ্য ক্রমে সেই স্ত্রীর গর্ভে যদি দুই একটি কন্যা জন্মে, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যারা পাছে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে, এই ভয়ে পিতা মাতা তাহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে দেন না। বংশজ

কন্যারা অবিবাহিতাবস্থায় পিতা মাতার নিকটে যথোচিত আদর পাইয়া থাকে; কিন্তু সে আদরের সহিত স্নেহের সংস্রব থাকে না। যেমন কসাইএরা গো শাবককে উত্তম রূপ আহার দিয়া হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া তুলে, তাহার পর, উচ্চ মূল্যে গোখাদকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে; বংশজ ব্রাহ্মণদিগের অভিপ্রায়ও সেই রূপ। কিসে কন্যাগুলি শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিবে, সাজাইলে গুজাইলে সুন্দর দেখাইবে, সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিয়া থাকেন। যদি কোনও বংশজ ব্রাহ্মণের কন্যা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, তাহা হইলেই কন্যার জনক চারি শত কি পাঁচ শত টাকা মুল্য অবধারিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহাদিগের অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন, তাঁহারা তিন চারি বৎসর বয়স্কা কন্যাকেই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ সুপ্রতুলের সংসার, তাঁহারা দশ এগার বর্ষ বয়সে সহস্র মুদ্রা মূল্যে এক একটি কন্যাকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। কেবল উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিব, এই অভিপ্রায়ে আপন আপন কন্যা সন্তানগুলিকে সাধ্যানুসারে যত্ন পূর্ব্বক বর্দ্ধিত করেন; কিন্তু উচ্চ পণ পাইলে, অপাত্রে ন্যস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

কথিত আছে, বঙ্গাধিপ মহারাজ বল্লাল সেন নব গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, এবং দান এই নব গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরাই তৎকালে কুলীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নব গুণ নব দোষে দাঁড়াইয়াছে; তথাপি, কৌলীন্য মর্য্যাদার হানি হয় নাই। প্রাচীন লোকের মুখে গল্প শুনা যায়, পুরা কালের কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয়

পণ্ডিত ছিলেন,এবং তাঁহাদিগের বিদ্যারত্ন,তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার ও বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সম্মান সূচক উপাধি ছিল। সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রধান প্রধান কুলীনদিগকে তৎকালের ভূপতিরা অনেক পরিমাণে নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন, কাহারও বা শ্বশুর দত্ত, ও কাহার বা মাতামহ দত্ত ভূমি সম্পত্তি ছিল। সেই সকল নিষ্কর ভূমি সম্পত্তির উপস্বত্বে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত ; কিন্তু বংশজ ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব কালে যারপর নাই হীনাবস্থাপন্ন ছিল। তাহারা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই তাহাদিগকে আদর করিত না ; এই জন্য, কাহারও বৃত্তি বিধান ছিল না। অন্য কি কথা, ব্রত নিয়মে কি যাগ যজ্ঞে কুলীন ব্রাহ্মণদিগকেই লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া দ্রব্যাদি দান করিতেন। বংশজ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে, অপাত্রে দান করা হয় বলিয়া তাহারা যাগ যজ্ঞেও এক কপর্দ্দক প্রাপ্ত হইত না। এক্ষণকার মত তৎকালে চাকুরির সুবিধা ছিল না ; এই জন্য, বংশজ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই কৃষীবল লোকের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাত করিত। কাল প্রভাবে, বংশজ ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পাচকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বংশজ ব্রাহ্মণ। এতদ্ভিন্ন, মিঠাইওয়ালা, রুটীবিস্কুট ওয়ালা, এবং যজ্ঞোপবীতধারী মুদির দোকানওয়ালারা প্রায় সকলেই বংশজ ব্রাহ্মণ। ইহা অপেক্ষা আরও একটি শোচনীয় বিষয় আছে, ঐ সকল বংশজ ব্রাহ্মণেরা কলিকাতার মধ্যে ছত্রিশ বর্ণের, বিশেষতঃ বেশ্যাকুলের যাজন কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল ব্রাহ্মণেরা আপন আপন বংশ রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে ; কিন্তু

এক জনের বিবাহ ন্যূনকল্পে পাঁচ ছয় শত টাকার কম কখনই নির্ব্বাহ হয় না। বিবাহের জন্য অনেকে বহু কাল ধরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। যখন কন্যা ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হয়, তখন তাহাদিগের বয়ঃক্রম ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়া উঠে; সেই বয়সে তাহারা সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় একটি কন্যার পাণি গ্রহণ করে।

পাঠকগণ, এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে চির কাল পাচকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, সে বর সাজিয়া বিবাহ করিতে গেলে, তাহার কি রূপ শোভা সম্পাদন হয়। বর যত কেন কুৎসিত, কদাচার, ও মহামূর্খ হউক না, কন্যার পিতা মাতা বিবাহ রজনীতে সে দিকে এক বারও দৃষ্টিপাত করেন না। বরকর্ত্তা তোড়া বাঁধা টাকা আনিয়া কন্যা কর্ত্তার সম্মুখে ঢালিয়া দেন, তিনি সেই টাকাগুলি বুঝিয়া সুঝিয়া লইয়া সিন্ধুকজাত করিতে পারিলেই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইল, নিতান্ত জ্ঞান করেন। কন্যাটি বালিকা; সপ্তম অষ্টম বর্ষ বয়সে ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে না। আমার বিবাহ হইতেছে,—এই আহ্লাদেই কন্যাটি উন্মত্ত হইয়া থাকে। আমি কিরূপ পাত্রের হস্তে পড়িলাম, অর্থ লোলুপ জনক কেবল এক অর্থের জন্য জন্মের মত আমাকে মূর্খ দরিদ্রের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, বিবাহ রাত্রে এ সকল চিন্তা সেই বালিকার মনে উদয় হয় না সত্য; কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই বালিকাটি আপনার অবস্থা বুঝিয়া লয়।

আমাদিগের দেশে বিবাহের বন্ধন লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধন অপেক্ষাও সুদৃঢ়; সেই জন্য, কন্যাটি বয়স্থা হইয়া ভাল মন্দ

বুঝিতে পারিয়াও অগত্যা সেই অযোগ্য পতির সেবা ভক্তিতে রত হয়। কারণ, এ দেশের ব্যবস্থানুসারে বংশজ ব্রাহ্মণের কন্যারা বিশিষ্ট বিধানেই বুঝিতে পারে যে, পিতা যখন ধন-লোলুপ হইয়া আমাদিগকে অসৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আর আমাদিগের গত্যন্তর নাই; এই পতি লইয়াই আমাদিগকে আমরণ কাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; বিবাহের বন্ধন আর কোনও ক্রমেই ছিন্ন হইবার নহে। কালে সেই সকল বংশজ-কন্যাদিগের গর্ভে বহু অপত্য জন্মে; কিন্তু অর্থাভাবে তাহাদিগের উচিত মত লালন পালন হয় না, সময়ে বিদ্যাশিক্ষা হয় না। সুতরাং, বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহারাও পিতৃ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চেষ্টা করে। এই রূপ বিবাহ দ্বারাই অস্মদ্দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উঠিতেছে। যাহাদিগের কিছু মাত্র সঞ্চিত ধন নাই, পিতৃ পিতামহের প্রদত্ত বিষয় বিভব নাই, কেবল শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা আহরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তাহাদিগের বংশরক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? যে বংশ নির্ব্বংশ হইলে, সংসারের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না, সে বংশ রক্ষা করিতে গিয়া দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই সর্ব্বনাশের কারণ। আমাদিগের দেশের লোকে আপন আপন বংশকে চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, নন্দবংশ, কি তৈমুর বংশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিসে বংশরক্ষা হইবে, কিসে পিতৃকুলের জল পিণ্ডের সংস্থান হইবে, এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। অনেকে পিতৃ পিতামহগণের পরলোকের পিণ্ডের সংস্থান করিতে গিয়া আপনাদিগের ইহলোকের পিণ্ড লোপ করিয়া ফেলেন।

কোনও প্রাচীন লোকের মুখে গল্প শুনা গিয়াছে, এক জন বংশজ ব্রাহ্মণের বিশ পঁচিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল। সেই কয়েক বিঘা ভূমিতে চাষ বাস করিয়া কষ্টে স্রষ্টে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের পিতা মাতা পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহাকে স্বহস্তে গৃহকার্য্য ও রন্ধনাদি করিতে হইত; যেহেতু, সংসারে তিনি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সর্ব্বদা তিনি মনে মনে ভাবিতেন,—আমি মরিলেই আমাদিগের বংশ একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। অবসর ক্রমে যে কোনও প্রকারে হউক, বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দীর্ঘ কাল এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র অবশেষে দার পরিগ্রহ করাই স্থির করিলেন। পূর্ব্ব কথিত সেই কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছয় শত টাকা মূল্যে বিক্রয়ান্তর নবম বর্ষীয়া একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাটীতে আনিলেন। গৃহে জন মনুষ্য নাই যে, বরকন্যা বরণ করিয়া লইবে; সুতরাং, বর শিবিকা হইতে নামিয়া পুরোহিত ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনিলেন। পুরোহিত গৃহিণী এবং তাঁহার দুই তিনটি কন্যা সহাস্য আস্যে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া বরকন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া দিয়া গেলেন। অর্দ্ধ ঘন্টার মধ্যেই যাঁহারা ব্রাহ্মণের বাটীতে বরকন্যা দেখিতে আসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন; বাটীর মধ্যে কেবল নব দম্পতী। কন্যাটি সেই নির্জ্জন গৃহে এক কদাকার পুরুষ মাত্র রহিয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নব প্রণয়িনীর রোদন ধ্বনিতে ব্রাহ্মণ শশব্যস্ত হইয়া পুনরায় পুরোহিত ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন,—ঠাকুরুণদিদি, তুমি

উঁহাকে বুঝাইয়া বল যে, এ বাড়ী ঘর দ্বার সকলই ত উঁহার। এতদ্ভিন্ন, আজি হইতে আমি যাহা উপার্জ্জন করিব, তৎসমুদায়ই উঁহার হইবে। ঘরে শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, একলা ঘরের একা গৃহিণী হইয়া চির কাল সুখে কাল কাটাবেন; তবে কি জন্য কাঁদিতেছেন? এই সকল কথার পর, বর কন্যার মুখের কাছে গিয়া 'ক্ষিদে পেয়েচে? ক্ষিদে পেয়েচে?' বলিতে লাগিলেন। ঠাক্‌রুণদিদি শুনিয়া কহিলেন,—ও যে কনে বৌ, এরি মধ্যে কি তোমার কাছে চেয়ে খাবে? দিন কতক কাল মন বুঝে খেতে দিও। জান ভাই, যত্নে জানোয়ার বশ হয়। এখন দু দিন কাঁদবে না? আমাদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা এসে সর্ব্বদা তোমার বৌএর সঙ্গে খেলা ধূলো কোরবে। এম্‌নি ধারা দিন কতক কল্লেই আবার দেখ, এখান থেকে আর যেতে চাইবে না।

বংশজ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একটি নবম বর্ষীয়া বালিকাকে ক্রয় করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই বালিকাটির রক্ষাবেক্ষণের জন্য মুহূর্ত্ত কাল বাটীর বাহির হইতে পারেন না; সর্ব্ব ক্ষণ সহধর্ম্মিণীকে লইয়া বাটীর অভ্যন্তরে বসিয়া থাকেন। ক্রমে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বোধে সহধর্ম্মিণীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শ্বশুরের সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, যত দিন আমার স্ত্রী বয়স্থা না হন, তত দিন আমি মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া তাঁহার খোরাকী স্বরূপ পাঠাইয়া দিব। আমার সংসারে কেহই নাই, এই জন্যই আপনার নিকটে রাখিতে বাধ্য হইলাম। শ্বশুর সেই নিয়মেই সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ উপার্জ্জনের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও জমিদারের বাটীতে সাত টাকা বেতনে পাচকের কর্ম্মে

নিযুক্ত হইলেন। মাসে মাসে না হউক, দুই তিন মাস অন্তর শ্বশুরালয়ে কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

এ দিকে নরপিশাচ শ্বশুর স্বীয় কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। গৃহিণীকে কহিল,—মেয়ের মাথার সিন্দূর উত্তম করিয়া উঠাইয়া দাও, যেন সিঁতায় সিন্দূরের চিহ্ন মাত্র না থাকে, এবং অবিবাহিতা কন্যার মত কোমরে কাপড় জড়াইয়া রাখ। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, বিবাহ হয় নাই, পাত্র অনুসন্ধান করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ যখন স্বীয় দুহিতার প্রথম বিবাহ দিয়াছিল, তখন গ্রামস্থ লোকদিগকে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে দেয় নাই। বিশেষতঃ, সেই দুরাত্মার আরও দুইটি কন্যা ছিল; কোন্‌টির বিবাহ হইয়াছে, কি না হইয়াছে, প্রতিবেশীরা তাহার সঠীক সংবাদ রাখিতেন না। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার কন্যাটিকে বিক্রয় করিবার জন্য এক জন ঘটকীকে ডাকাইয়া কহিল,—তুমি যদি আমার কন্যাটির ভাল ঘরে বিবাহ দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাকে বিংশতি মুদ্রা পারিতোষিক দিব। দেখ, আমার মেয়েটি দেখিতে কেমন সুশ্রী! বয়ঃক্রমও দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। দোজবেরে বর হইলে, এরূপ মেয়ে অধিক পণ দিয়া বিবাহ করিবে। তুমি একটু গা ঘামাইয়া পাত্র অনুসন্ধান কর, আর তোমাকে অধিক কি বলিব। ঘটকী মনে মনে ভাবিল যে, কন্যাকর্ত্তা যখন আমাকে বিংশতি মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইল, তখন বরের নিকট হইতেও আমি আর কিছু পাইতে পারিব; অতএব, বিশেষ চেষ্টা করিয়া এ মেয়েটির বিবাহ দিতে হইবে। ঘটকী দেশে বিদেশে অনুসন্ধান

করিয়া একটি দোজবেরে পাত্র স্থির করিল। পাত্রের পিতা মাতা, ভাই ভগিনী সকলেই আছে। পল্লীগ্রামের মধ্যে পাত্রের পিতা এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি। কৃষিকার্য্য দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকার সঙ্গতি করিয়াছেন। পাত্রের প্রথম বারে যে কন্যাটির সহিত বিবাহ হইয়াছিল, সেটি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল; তাহার পর, গতায়ু হয়। পুত্রবধূর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিলেন। বংশজ ব্রাহ্মণের ঘরের স্ত্রী বিয়োগ সামান্য বিপদ্ নহে। ব্রাহ্মণ সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। নবপত্নীর অকাল মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের পুত্র একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের ঐ এক মাত্র পুত্র, জল পিণ্ডের স্থল। বিশেষতঃ, তাঁহার দশ টাকার সঙ্গতি আছে; সেই জন্য, তিনি শীঘ্র শীঘ্র পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব কথিত ঘটকী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং ঘোর বাগাড়ম্বর করিয়া কহিল,—ঘোষাল মহাশয়, আপনার যেমন বৌ গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট বৌ আমি আনিয়া দিব। মেয়ের রূপের কথা কি বলিব, যেন ছবি খানি! কোনও অঙ্গে খুঁত নাই, বয়স এগার বৎসর। মেয়ের বাপের কোট্ ভারি, ছয় শত টাকা পণের কম বিবাহ দিতে চাহে না; কিন্তু মহাশয়, আমার অনুরোধ যে, অমন মেয়ে হাত ছাড়া করিবেন না। টাকা অনেক হইবে, কিন্তু অমন মেয়ে আর হইবে না। একে সুশ্রী, তাহাতে একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। লজ্জা প্রযুক্ত পিতাকে বলিতে না পারিয়া, মাতাকে

কহিলেন,—মা, যদি ওই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দাও, তবেই বিবাহ করিব; তাহা না হইলে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগী হইব। পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বামীকে কহিলেন,—ওই মেয়ের সঙ্গেই আমার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে, ইহাতে তুমি অমত করিতে পারিবে না। ছেলে যদি বিবাগী হইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিব। সুতরাং, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মতেই মত দিলেন। এক মাসের মধ্যেই সমারোহের সহিত শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

এ দিকে পূর্ব্ব কথিত দুষ্ট ব্রাহ্মণের প্রথম জামাতা দুই তিন মাস অন্তর আপনার সহধর্ম্মিণীর ভরণ পোষণের জন্য ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কাল টাকা পাঠাইলেন। এতদ্ভিন্ন, পূজা পার্ব্বণে নূতন বস্ত্র ও আপনার ক্ষমতার উপযুক্ত দুই এক খানি রৌপ্যাভরণও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া আপনার সহধর্ম্মিণীর কুশলাদি সমাচার লইতেও ত্রুটি করেন নাই। পত্রের প্রত্যুত্তরে শ্বশুর ঠাকুর বাটীর সমস্ত কুশল লিখিয়া পাঠাইতেন। যে জমিদারের বাটীতে উক্ত ব্রাহ্মণ পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই জমিদার মহাশয় পাচকের কার্য্য-দক্ষতা ও সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। একাদি ক্রমে তিন বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ আপন প্রভুর নিকট দুই মাসের অবসর প্রার্থনা করায়, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ পাচককে কহিলেন,—তুমি দীর্ঘ কাল বাটীতে থাকিও না। আমি তোমাকে দুই মাসের জন্য অবসর দিতেছি, যদি এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়া

আইস, তাহা হইলে, আমি তোমার কিছু মাত্র বেতন কর্ত্তন করিব না। আর যদি ছুটীর অধিক কাল বাটীতে বসিয়া থাক, তাহা হইলে, যত দিন অনুপস্থিত থাকিবে, তত দিনের বেতন কর্ত্তন করিয়া লইব। পাচক যে আজ্ঞা বলিয়া যাহা কিছু বেতন প্রাপ্য ছিল, তৎসমুদায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিল। গমন সময় সহধর্ম্মিণীর জন্য দুই তিন খানি উত্তম বসন ও আরশি চিরণী প্রভৃতি পল্লীগ্রামের দুর্ল্লভ সামগ্রী কতকগুলি ক্রয় করিয়া লইল। ব্রাহ্মণ নিজ বাটীতে এক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। কৃতান্তের অনুচর নরপিশাচ শ্বশুর প্রথম জামাতাকে পুনরাগত দেখিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিল। জামাতা সরল হৃদয়ে শ্বশুর মহাশয়ের চরণ বন্দন করিয়া বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করাতে, শ্বশুর অধোবদনে বসিয়া রহিল, জামাতার কথায় কোনও উত্তর দিল না। জামাতা শ্বশুর মহাশয়কে নত শিরে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া মনে মনে নানা অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিল। এ দিকে জামাতা বাটীতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যা জননীকে গিয়া বলিল,—মা, সেই মড়ুই পোড়া মিন্‌সে আবার এসেছে। মাতা কহিলেন,—বলিস্ কি! কন্যা কহিল,—আর কি বল্‌ব? ঐ দেখ, বাবার কাছে ব'সে আছে। ব্রাহ্মণী দেখিলেন, কর্ত্তা অধোবদনে উপবিষ্ট। তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর গিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ওগো, আমার ঘরশোভা যে আমায় তিন মাস ছেড়ে গেছে গো! বাবা গো!' ইত্যাদি করুণ রসাত্মক বাক্যে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। শাশুড়ীর এইরূপ ক্রন্দন ধ্বনি জামাতার কর্ণ

কুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র একেবারে শ্বশুরের পদতলে লুটাইয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্বশুর অনেক চেষ্টা করিয়াও চক্ষে জল আনিতে পারিল না। অবশেষে, দুই করে দুই চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে জামাতাকে কহিল,—বাপু হে, আর কাঁদিলে কি হইবে? এ সকল ঈশ্বরাধীন কার্য্য। এই রূপ প্রবোধ দিতে দিতে হঠাৎ স্মরণ হইল যে, এ বেটার পোঁট্‌লা দুটো যদি হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে, বিলক্ষণ ঠকিতে হইবে। পরে দুই চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ডাকিয়া কহিল,—ওমা উজ্জ্বলা! মা, এই পোঁট্‌লা দুটো বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা, আর বাবাজীকে এক গাড়ু জল এনে দে। দস্যু কন্যা তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল। পুঁটুলী দুটি বাটীর ভিতর যাওয়াতে, ব্রাহ্মণ পত্নী তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্যে তিন খানি উত্তম বসন, ও নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী রহিয়াছে। সেই গুলি জামাতা আর ফিরাইয়া লইয়া না যাইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী আর এক বার কাঁদিয়া উঠিলেন,—ও মা ঘরশোভা গো! তোমার জন্যে যে কত সামগ্রী এসেচে গো! তুমি কোথায়—মা গো? বাহির বাটী হইতে ব্রাহ্মণ উচ্চ শব্দে বলিলেন,—তুমি আর অমন কোরে কেঁদ না। বাবাজী যা যা এনেচেন, তা তুলে রাখ। আমি এমন জামাই ছাড়্‌তে পার্‌বো না, এই বৈশাখ মাসেই মুক্তর (কনিষ্ঠা কন্যা) সঙ্গে বাবাজীর বিবাহ দেব। শ্বশুরের এই মধু মাখা কথা শুনিয়া জামাতা উঠিয়া বসিল, এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া শ্বশুরের সম্মুখেই উপবিষ্ট হইল। ধূর্ত্ত শ্বশুর কহিলেন,—বাবাজি, দুঃখের কথা কি বল্‌ব! একে ঘর-

শোভার শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে, তার ওপরে প্রতি-বেশী বেটারা আমার ওপর ভারি লেগেচে। আমি সৎ কি অসৎ, তা ত তুমি ভাল রূপ জান। আজ কাল ভাল মানুষের বাপ ভাঁট্‌কুড়ো। সে সব কথা ইহার পরে হইবে, এখন তুমি বাটীর ভিতর গিয়া পাতকুয়ার জলে স্নান করগে, পুকুরে স্নান কর্ত্তে গিয়ে কাজ নেই—কোন্ বেটা ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌বে ; তাই বল্‌চি, কাজ কি বাবা ?—প্রতিবেশীর সহিত আমি বাক্যালাপ রাখি নে।

সে যাহা হউক, সময়ে স্নানাহার করিয়া শ্বশুর জামাতায় অনেক কথা বার্ত্তা হইল : অবশেষে, মুক্তকেশীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, এই কথাই এক প্রকার অবধারিত হইয়া গেল। শ্বশুর জামাতাকে বাটীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করাতে, জামাতা কিয়ৎ ক্ষণ বাটীর উঠানে ইতস্ততঃ পাদ সঞ্চালন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মনে মনে স্থির করিল যে, কল্য প্রত্যূষে একে-বারে মুনিবের বাটীতে চলিয়া যাইব। দুই মাস কাল বাটীতে গিয়া বসিয়া থাকিলে, কি হইবে ? বরং আমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া গেলে, কর্ত্তা বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। যদিও শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত মুক্তকেশীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু সে ত অমনি হইবে না। আমার গৃহশূন্য হইয়াছে, ইহা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে জানাইলে, তিনি আমার প্রতি বিশেষ কৃপা করি-লেও করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার নিকট যদি দুই এক শত টাকা হাওলাত লইতে পারি, তাহা হইলে, মুক্তার সহিত বিবাহ হইতে পারে। অতএব, কল্যই আমার এ স্থান হইতে প্রস্থান করা যুক্তি। মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া রজনীতে আহার

করিতে করিতে জামাতা শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। শ্বশুর কহিল,—হাঁ, তোমার এক্ষণে পুনর্ব্বার কর্ম্ম স্থানে যাওয়াই উচিত।

প্রত্যূষে জামাতা শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাওয়ায়, তাহারা সজল নয়নে বিদায় দিল। জামাতার পুঁটুলীতে যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদায়ই খুলিয়া লইয়া পরিধেয় দুই খানি বস্ত্র ও গামছা খানি আনিয়া হাজির করিল। পুঁটু-লীতে দশটি টাকা ছিল, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে দেখিয়া জামাতা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—আমার পথ খরচের জন্য একটি টাকা দিতে হইবে। তৎ শ্রবণে মুক্তকেশী কহিল,—সে টাকা আমি আমার পেঁট্‌রায় তুলে ফেলেছি। তোমার যদি নিতান্তই টাকার দরকার থাকে, তা হলে, মাএর কাছে এক টাকা ধার করে লও, বাটীতে গিয়াই পাঠিয়ে দিও। গৃহিণী কন্যার কথা শুনিয়া কৃত্রিম বিরস বদনে ক্ষণপ্রভার ন্যায় একটু হাসি হাসিয়া জামাতাকে একটি টাকা আনিয়া দিলেন। জামাতা সেই টাকাটি লইয়া গমনোন্মুখ হইবা মাত্র শ্বশুর কহিল,—চল বাবা, তোমাকে এগিয়ে দিয়া আসি। এই রূপে শ্বশুর জামাতাতে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে শ্বশুর ও জামাতাতে পৃথক্‌ হইল। শ্বশুর ভাবিল,—আপদ্‌ বালাই মিটিয়া গেল। ভবিষ্যতে ও হতভাগা আমার বাটীতে আর কখন না আইসে, ইহার পরে তাহার অনেক উপায় করিতে পারিব। অদ্য যে মানে মানে হতভাগাকে বিদায় করি-য়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে নরপিশাচ আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে, জামাতা শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে, এমন সময়ে গ্রামস্থ এক জন বৃদ্ধ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পল্লীগ্রামের লোকের এই রূপ ব্যবহার আছে যে, অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তদনুসারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আপনার নিবাস কোথায়? তদুত্তরে জামাতা কহিল,—হুগলি জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার কহিলেন,—এখানে কোথায় আসা হইয়াছিল? জামাতা কহিল,—কেশব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তাঁহার সহিত কি আপনার কোনও সুবাদ আছে? তদুত্তরে জামাতা কহিলেন,—আজ্ঞা হাঁ; আমি তাঁহার মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। বিবাহের পর, তিন বৎসর অন্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া শুনিলাম, আমার পত্নী গতাসু হইয়াছেন। মহাশয়, যাহাদিগকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়, স্ত্রী বিয়োগ তাহাদিগের পক্ষে কি সর্ব্বনাশের বিষয়, এক্ষণে তাহা আমি বিশিষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলাম। দার পরিগ্রহ করিয়া বংশরক্ষা করণ মানসে যে যৎ কিঞ্চিৎ পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে শোকে অভিভূত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিরক্ত বদনে কহিলেন,—রাম! রাম! সে নরাধমের মস্তকে বজ্রাঘাত হয় না কেন? ওহে বাপু, আর রোদন করিও না। তুমি যে প্রাণে প্রাণে শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, ইহাই ভাগ্য বলিয়া মান। তোমার শ্বশুর কৃতান্তের অনুচর; আমাদিগের গ্রামের লোক ঐ নরাধমের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত

করেন না। তোমার শ্বশুরের পিতা হরিহর চক্রবর্ত্তী যে সকল কাণ্ড করিয়া মরিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি করিতে গেলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বাপু হে, অগ্রে তোমার বড় শ্বশুরের দুই একটি পৈচাশিক কাণ্ডের কথা বলি, তাহার পর, তোমার শ্বশুরের গুণের কথা বিস্তারে বলিব।

তোমার বড় শ্বশুর হরিহর চক্রবর্ত্তীর দুইটি কন্যা ছিল। কন্যা দুইটি এক বৎসরের ছোট বড়, দেখিতে প্রায় একাকৃতি। কোন্‌টি ছোট, কোন্‌টি বড় সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইত না। আট শত টাকা পণ লইয়া হরিহর রামজীবনপুরের ঘোষালদিগের বাটীতে আপন জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেয়। এ অঞ্চলের মধ্যে ঘোষাল বাবুরাই সম্পন্ন ব্যক্তি। বড়মানুষ বৈবাহিক হওয়ায়, হরিহরের গুজরাণ নির্ব্বাহের কোনও কষ্ট রহিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের এক বৎসর পরে, সাদীপুর গ্রামের এক জন নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্রের সহিত ছয় শত টাকা পণে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহের দুই তিন মাস পরে, বিসূচিকা রোগে হরিহরের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হয়। বাপু হে, আশ্চর্য্যের কথা আর কি বলিব! সন্ধ্যার সময় হরিহরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মরিল, এই কথা পল্লীস্থ সকলেই শুনিয়াছিল। কিন্তু রজনীতে সেই কন্যাটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করিয়া আসিয়া প্রত্যূষে হরিহর ঘোষণা করিয়া দিল,—কে বলে, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মরিয়াছে? সে ত জ্যেষ্ঠা নহে, আমার কনিষ্ঠা কন্যাই মরিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পল্লীস্থ লোকেরা তদ্বিষয়ে কেহই বাদানুবাদ করিল না। হরিহর অনায়াসে কিছু দিন পরে সেই কনিষ্ঠা কন্যাকে জ্যেষ্ঠা বলিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল। ঘোষাল

বাবুরা এই ভয়ানক কাণ্ডের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তোমার শ্বশুর সেই নরাধম হরিহরের পুত্র। সে পিতা অপেক্ষাও এক হাত উর্দ্ধ হইয়া কার্য্য করিয়াছে। বাপু হে, তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় নাই। ছয় শত টাকা পণ লইয়া তোমার স্ত্রীকে পুনর্ব্বার নলডাঙ্গার কৃষ্ণকিশোর ঘোষালের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছে।

এই কথা শ্রবন মাত্রেই যুবক ব্রাহ্মণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল, এবং কহিল,—মহাশয়, বলেন কি! এরূপ নরাধমকে আপনারা কি বুঝিয়া পল্লীর ভিতর রাখিয়াছেন? ওঃ! এত দূর প্রতারণা! আমি অদ্যই মহাপাতকীকে যমালয়ে পাঠাইব। তাহাকে মারিয়া ফাঁসি যাইব! ফাঁসি যাইব! উঃ! আর সহ্য হয় না! মহাশয়, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এখনি গিয়া সেই নরমাংস বিক্রেতা নরাধমের জীবনান্ত করিব। এই কথা বলিয়া জামাতা গ্রামাভি-মুখে দৌড়িয়া যাইবার উপক্রম করায়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওহে যুবক, তুমি একেবারে উতলা হইও না, আমি যাহা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যদি তুমি পুনর্ব্বার শ্বশুরালয়ে যাইয়া একটা বিরোধ উপস্থিত কর, তাহা হইলে, তুমি সে নরা-ধমের কিছুই করিতে পারিবে না; বরং সেই বলে ছলে বা কৌশলে তোমার জীবনান্ত করিবে। এই জন্য বলিতেছি, শ্বশুরালয়ে আর না যাইয়া এই যাত্রাতেই তুমি নলডাঙ্গার ঘোষাল মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হও। প্রথমতঃ, তাঁহার বাটীতে যাইয়া আতিথ্য স্বীকার করিও। তিনি এক জন মহাশয় ব্যক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে।

'আমি অতিথি'—বলিয়া তাঁহার দ্বার দেশে দাঁড়াইলেই, তিনি মহাসমাদরের সহিত তোমাকে ভোজন পান করাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আহারান্তে সুস্থ হইয়া বসিলে পর, তিনি অবশ্যই তোমার নাম ধাম ও কি প্রয়োজনে কোথায় যাওয়া হইয়াছিল, কি হইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন; সেই সময়ে তুমি আপনার আদ্যোপান্ত অবস্থা বর্ণনা করিও। তৎ শ্রবণে ঘোষাল মহাশয় যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিবে; কদাচ, তাহার অন্যথা করিও না। আমার নিতান্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে, তিনি তোমার সহধর্ম্মিণীকে তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিবেন। কারণ, ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুসারে সে কন্যাটি এক্ষণেও তোমারই ভার্য্যা; কেননা, পরাশরসংহিতার মতে স্ত্রীলোকের পক্ষে পঞ্চ প্রকার আপদের স্থলে যে পুনঃ পতি গ্রহণের বিধি আছে, তাহা এরূপ স্থলে খাটিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, তোমার ভার্য্যার দ্বিতীয় সংস্কার হয় নাই; সুতরাং, তাঁহার সতীধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, এ কথা কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। তবে কোন্ বিধি মতে তোমার ভার্য্যা ঘোষাল মহাশয়ের পুত্রবধু প্রতিপন্ন হইবেন? আমার যত দূর শাস্ত্র জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার ভার্য্যা কোনও অংশেই ধর্ম্মচ্যুত হন নাই। অবলা বালিকার অনভিমতে তোমার শ্বশুর তাঁহাকে অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিয়াছে। আসুরিক বিবাহকে আমরা বিবাহ বলিয়াই গণ্য করি না; সুতরাং, এরূপ ঘটনাতে তোমার কিম্বা ঘোষাল মহাশয়ের জাতি যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তোমার শ্বশুরই দোষী হইয়াছে। কেবল

লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নহে, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, আইন অনুসারে তাহাকে গুরুদণ্ড অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। অতএব, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তুমি অতি সত্বরেই ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে গমন কর। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শানুসারে ব্রাহ্মণ যুবক তাহাই করিয়াছিল। পরে, ঘোষাল মহাশয়, এবং ঐ ব্রাহ্মণ যুবক একত্র হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে, বিচারে ঐ দুরাত্মা ব্রাহ্মণের গুরুদণ্ড হয়। যুবক ব্রাহ্মণ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বীয় পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ করে।

বংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই রূপ কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অদ্যাপি ঐ রূপ কুৎসিত প্রথার এক কালে তিরোভাব হয় নাই। অতি অল্প কাল হইল, তিন চারি জন ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া একটি কলুর বালিকা কন্যাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, এবং সেই কন্যার সহিত এক জন বংশজ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের পরিণয় দিবার সমস্ত উদ্যোগ করে। যে কলুর কন্যাটি অপহৃত হইয়াছিল, সে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যে গ্রামে তাহার কন্যার পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মণ তনয়ের সহিত সম্পন্ন হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, দৈবযোগে সেই গ্রামেই উপস্থিত হয়। গ্রামের মধ্য ভাগ দিয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ ছিল। সেই প্রশস্ত পথের পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে সেই কন্যাটি অবস্থান করিতেছিল। কলুরা দুই সহোদরে বিষণ্ণ বদনে রাজপথ ধরিয়া যাইতেছে, সৌভাগ্য ক্রমে সেই বালিকা গৃহের গবাক্ষ দিয়া তাহার পিতা ও খুড়াকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিল,—ওগো বাবা, আমাকে এই বাটীর

ভিতর ধরিয়া রাখিয়াছে, তোমরা আমাকে লইয়া যাও। আপন কন্যার কণ্ঠস্বর অনুভব করিয়া কলু বল পূর্ব্বক সেই বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, তাহারই কন্যা বাবা! বাবা! বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজ-দ্বারে অভিযোগ করিয়া বিস্তর কষ্টে কলু তাহার কন্যার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল।

কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে বিবাহে পরিবর্ত্ত প্রথা প্রচলিত আছে। রাঢ়ীয় কুলীনের নবগুণের মধ্যে 'আবৃত্তি' এই শব্দটির অর্থ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কুলীনেরা পরিবর্ত্ত দ্বারা পরস্পার মেল বদ্ধ হইতেন। এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ আপনার দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য অশীতি বর্ষ বয়সে পরিবর্ত্ত সূত্রে একটি অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন। পরিবর্ত্তের নিয়ম এই যে, তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, তাহা হইলে, আমার পুত্রের সহিত তোমার এক কন্যার বিবাহ দিব। পাত্রের অভাব ঘটিলে, কিম্বা অর্থের অনটন হইলে, অনেক ব্রাহ্মণ কুলীনকে পরিবর্ত্ত সূত্রে বৃদ্ধ বয়সে তিন চারিটি বিবাহ করিতে হয়। তাদৃশ অর্থ নাই, অথচ, দুই তিনটি ভগিনীর বিবাহ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ কুলীন সন্তানদিগের এক পরিবর্ত্তই জাতি কুল রক্ষার প্রধান উপায়। কুলীন ব্রাহ্মণেরা কুল রক্ষার জন্য এই পরিবর্ত্ত বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আজ কাল বংশজ ব্রাহ্মণেরাও পরিবর্ত্ত করিয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল অপকৃষ্ট বংশজ ব্রাহ্মণের সাত আট শত টাকার ন্যূন বিবাহ হয় না, তাহাদিগের যদি একটি ভগিনী, কি ভাগিনেয়ী কি ভ্রাতুষ্কন্যা

থাকে, তাহা হইলে, সেই কন্যাটিকে অন্য এক জন বংশজ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ভগিনী, কি ভাগিনেয়ী, কি ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। এরূপ হইলে, পরস্পারকে আর পণের টাকা দিতে হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে, যদি দুই জন বংশজ ব্রাহ্মণ আপন আপন ভ্রাতুষ্কন্যাকে পরিবর্ত্ত করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে, তাহা হইলে, যে মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, ও যাহার নয় দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তাহার পিতা মাতা অন্য পাত্রের নিকট কিছু পণ ধরিয়া লয়। তাহারা বলে,—তোমার ভ্রাতুষ্কন্যার বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র, দেখিতেও সুশ্রী নহে ; এ মেয়ের পরিবর্ত্তে আমরা এমন সুন্দর ও বড় মেয়ে দিতে পারিব না। তবে যদি দুই শত টাকা গা বাটা দিতে পার, তাহা হইলে, আমরা এ বিবাহে সম্মত আছি। অপর পক্ষের নিতান্ত গরজ হইলে, সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হয়। পরিবর্ত্ত প্রথা অনেক সময়ে বংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে ; এই সূত্রে মধ্যে মধ্যে মামলা মোকদ্দমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল ;—

প্রসিদ্ধ আড়ংঘাটা চূর্ণী নদীর পূর্ব্ব পারে স্থিত। আড়ংঘাটা হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে খিস্‌মিয়া বলিয়া এক খানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন, এবং নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী করিয়া বহুসংখ্য ছাত্রকে পড়াইতে আরম্ভ করায়, তিনি তদঞ্চলের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর। পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর দার পরিগ্রহ করিবার জন্য

অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু অর্থাভাবে ব্রাহ্মণের সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর যৎকালে অধ্যাপক হইয়া চতুষ্পাঠী করিলেন, সে সময় ব্রাহ্মণের বয়স পঞ্চান্ন হইয়াছে। এই জন্য, তিনি নিজে বিবাহ করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া বংশ রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের তর্কালঙ্কার উপাধি হইয়াছিল। তর্কালঙ্কারের শাস্ত্রজ্ঞান থাকায়, কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহের কথা মুখেও আনিতেন না। এক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন,—ভ্রাতঃ, তুমি ত এখন দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছ, এবং তোমার বয়ঃক্রমও অধিক হয় নাই। এ সময়ে তুমি যদি একটি দার পরিগ্রহ না কর, তাহা হইলে, আমাদিগের বংশ লোপ পায়। তর্কালঙ্কার কহিলেন,—আমার বিবাহ করিতে অমত নাই, শাস্ত্রে আছে,—'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।' ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে, সে পত্নীর গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া গিয়াছেন। সে পুত্র পিণ্ডদান করিলে, স্বর্গীয় পিতৃগণ তাহা প্রাপ্ত হন না। যদি পিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন, তাহা হইলে, ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়ঃ। তৎশ্রবণে তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা কহিলেন,—শাস্ত্রানুসারে ইহার একটি সদুপায় হইতে পারে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে 'উত্রা' পরিবর্ত্তের একটি ব্যবস্থা আছে। তুমি যদি 'উত্রা' পরিবর্ত্ত করিয়া বিবাহ কর, তাহা হইলে, সকল দিক্ রক্ষা হইবে। তদুত্তরে তর্কালঙ্কার কহিলেন,—হাঁ,'উত্রা' পরিবর্ত্ত দ্বারা বিবাহ করিলে, শাস্ত্রানুসারে সে বিবাহে কোনও দোষ স্পর্শ হয় না সত্য, কিন্তু দত্তা কন্যাকে প্রতিগ্রহ করা, বিবাহের পক্ষে যেরূপ

সুবিধান, এরূপ আর কিছুতেই নহে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা কোনও সদ্ব্রাহ্মণ আমাকে কন্যাদান করেন। আমি কিছু অসৎ পাত্র নহি, যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে ব্যবসায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই ব্যবসায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই সদ্ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করিয়া আপনার স্ত্রীকে অনায়াসে দশ তোলা স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ দিতে পারিব। তথাপি, কৌলীন্যাভিমানী ব্রাহ্মণেরা আমাকে বংশজ ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনও কন্যা দান করিবেন না। এক জন মহামূর্খ নরাধমকে অনায়াসে এক কালে পাঁচটি কন্যা দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতী কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। অসৎ এবং অক্ষম পাত্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায়, সেই সকল অবলা কুলীন কন্যাগণের অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি, দোষাকর দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুগত উচিত কার্য্য করিতে কেহই স্বীকৃত হইবেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কহিলেন,—ভ্রাতঃ, তুমি যাহা বলিলে, তাহার একটি কথাও অসত্য নহে; কিন্তু যাহা কোনও কালে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, সে বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। এখনকার মূল কথা এই যে, তোমাকে অবশ্যই দার পরিগ্রহ করিতে হইবে। ক্রীত কন্যাকে বিবাহ করিতে তোমার শ্রদ্ধা নাই, এবং আমিও তদ্বিষয়ে কখনই অনুরোধ করিব না; কিন্তু 'উত্রা' পরিবর্ত্ত দ্বারা তোমার বিবাহ দিতে আমি এক প্রকার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি। তর্কালঙ্কার কহিলেন,—আপনি পিতৃতুল্য পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমার সাধ্য কি যে আপনার আজ্ঞা অবহেলা করি।

আমার বিবাহ দিতে যদি আপনার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমি কথনই তদ্বিষয়ে অন্য মত করিব না।

ভ্রাতাকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক চেষ্টার পর, আনন্দধামের নিকটে মশুণ্ডা গ্রামের যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পৌত্রীর সহিত ভ্রাতার শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষ। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায়, ভট্টাচার্য্য একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। যেমন সতী বিয়োগের পর, মহাদেব সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্ত প্রায় ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই রূপ যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের স্কন্ধে মৃত ব্রাহ্মণী ভিন্ন আর আর সমুদায় লক্ষণই প্রকৃত মহাদেবের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। ভট্টাচার্য্যের এক মাত্র পুত্র ছিল। সেই পুত্র একটি কন্যা রাখিয়া গতাসু হয়। ভট্টাচার্য্যের বিধবা পুত্রবধু সেই কন্যাটিকে লালন পালন করিয়া কথঞ্চিৎ স্বামী শোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বধূটির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কুলীনেই হউক বা বংশজেই হউক, কন্যাটিকে এরূপ পাত্রে ন্যস্ত করিব, যাহাতে কোনও কালে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না পায়। খিসূমিয়ার তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রবধূর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; কেননা, তিনি লোক পরম্পরায় অবগত হইলেন যে, পাত্রটি অল্পবয়স্ক, সুবিদ্বান্ এবং দেখিতেও সুশ্রী, তাহার উপর আবার দশ টাকার বিষয় বিভব আছে। এ দিকে যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন,—মহাশয়, শুনিয়া থাকিবেন, আমার গৃহশূন্য হইয়াছে; সুতরাং, ঐ

পৌত্রীটি পরিবর্ত্ত করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে হইবে। ফল কথা এই যে, আপনি যদি আমার বিবাহ দিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, আমার পৌত্রীটি আপনার ভ্রাতাকে সম্প্রদান করিব। তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি বহু অন্বেষণের পর, কামগাছি গ্রামের গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর পৌত্রীর সহিত যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যে কন্যাটির সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল, তাহার মাতা সংগোপনে সংবাদ লইলেন যে, পাত্র ষষ্টি বৎসরের এক জন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ; আমার শ্বশুর মহাশয় ছয় শত টাকা পণ লইয়া আমার এক মাত্র দুহিতাকে জলে ফেলিয়া দিতেছেন। গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর পুত্রবধূ অত্যন্ত প্রগল্ভা ; তিনি মনে করিলে, না পারেন এমন কর্ম্মই নাই। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর, তিনি সংগোপনে স্বীয় সহোদরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভ্রাতা উপস্থিত হওয়ায়, ভাই ভগিনীতে এই রূপ পরামর্শ স্থির হইয়া রহিল যে, বিবাহের রাত্রে আমরা মেয়েটি লইয়া পলায়ন করিব।

এ দিকে দুই বাটীতেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় বর বেশে যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে বিবাহ করিতে গেলেন। গোধূলি লগ্নে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। পৌত্রীকে পাত্রস্থ করিয়া বর বেশে যোগেশ্বর স্বয়ং বিবাহ করিতে চলিলেন। বর উপস্থিত হওয়ায়, গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী যথাবিহিত সমাদরে বর এবং বরযাত্রীদিগকে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট করাইলেন। বর আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া অন্দর বাটীর স্ত্রীলোকেরা বর দেখিতে বাহির

বাটীর দিকে ছুটিলেন, সেই সময়ে গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর পুত্রবধূ কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রাতার সমভিব্যাহারে গ্রামের প্রান্ত ভাগের এক নিবিড় বাঁশ বনের ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে সুরধুনী তটে আসিলেন। তথায় এক খানি ডিঙ্গী ভাড়া করিয়া ভ্রাতার সহিত সেই রজনীতেই আপন পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে, বর সভা সমক্ষে আচমন ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছাদ্‌না তলায় গিয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রী-লোকেরা হুলাহুলি ধ্বনি দিয়া কন্যা আনিতে গিয়া দেখেন যে, চণ্ডীর পুথী ও শূন্য পীঠ পড়িয়া রহিয়াছে; গৃহ মধ্যে কন্যাও নাই, কন্যার মাতাও নাই। মুহুর্ত্ত কালের মধ্যে চক্রবর্ত্তীর বাটীতে একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। কন্যাযাত্রী এবং বরযাত্রী একত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন,—ভয়ের প্রয়োজন নাই। কন্যার মাতা কন্যা লইয়া নিকটেই কোথায় লুকাইয়া আছেন, এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে স্ত্রীলোক হইয়া কোথায় পলায়ন করিবেন? গোটা কতক মশাল জ্বালিয়া চারি দিক্ অন্বেষণ করিলে, এখনই ধরা পড়িবেন। এই যুক্তি সুযুক্তি বোধে বলবান্ পুরুষেরা কেহ বা প্রদীপ, কেহ বা লণ্ঠন, কেহ বা মশাল হস্তে চারি দিক্ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কোথাও তাহাদিগের অনুসন্ধান পাইল না। অবশেষে, জন কতক লোক মশাল হস্তে গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াইল, কেহ কেহ বা গ্রামের পার্শ্বস্থ সদর রাস্তায় গিয়া আড্ডা করিল। এই রূপ গোলযোগে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। কোনও প্রকারেই কন্যা ও কন্যার মাতার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। প্রত্যূষে চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—আপনারা আমার বাটীতেই অবস্থান করুন, আমি

বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। যেখানে পাই, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিব, যে প্রকারে পারি, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিব। এই কথা বলিয়া বর ও বরযাত্রীদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং কয়েক জন বলবান্ জ্ঞাতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুত্রবধূর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তীকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া তাহারা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—না মহাশয়, এখানে তাহারা আইসে নাই। আমাদিগের ঘর দ্বার ও বাটীর চতুঃপার্শ্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যদি সে মেয়েটি লইয়া কুপথগামিনী হইয়া থাকে, তবেই সর্ব্বনাশ; নতুবা, যেখানে কেন লুকাইয়া থাকুক না, এক দিন অবশ্যই ধরিতে পারিব। গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীকে তৎকালে সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিতেছিল। তিনি আর সেখানে মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া পুত্রবধূর মাতামহালয়ে উপস্থিত হইলেন। যখন সেখানেও কোনও সন্ধান পাইলেন না, তখন একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ মেয়েটি লইয়া কোনও লম্পট পুরুষের সহিত অতি দূর দেশে পলায়ন করিয়াছে। অবশেষে, পুত্রবধূকে ধৃত করিবার কোনও উপায় না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে, তর্কালঙ্কার বিবাহ করিয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে মনের আহ্লাদে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন বিকালে এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাঁহার দাদাশ্বশুরের বিবাহ হয় নাই। বর্ষীয়ান্ বর দেখিয়া চক্রবর্ত্তীর পুত্রবধূ যে-রূপ কাণ্ড করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই লোকের মুখে শুনিলেন।

তর্কালঙ্কার নিতান্ত ভদ্রলোক, তিনি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ডাকিয়া কহিলেন,—মহাশয়, একি ভয়ানক কথা! শুনিলাম, চক্রবর্ত্তীর পুত্রবধূ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমাদিগকে বিষম গোলযোগে পড়িতে হইবে। উভয় ভ্রাতায় এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময় যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য স্বদলে তর্কালঙ্কারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তর্কালঙ্কারকে দেখিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল,—ব্রহ্মহত্যা হইব! ব্রহ্মহত্যা হইব! আমার সহিত প্রতারণা! বেটা ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে এসে বোসে আছ! তুমি বেটা না টোলধারী পণ্ডিত? তুমি ডাকাত! তর্কালঙ্কার মহাশয় তদ্দণ্ডে আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া দাদাশ্বশুরের চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন,—মহাশয়, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ভয়ানক দৈব বিপাকেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। আপনি আমার বাটীতে অবস্থান করুন, আমি যে প্রকারে পারি, আপনার বিবাহ দিয়া আপনারে সস্ত্রীক বাটীতে পাঠাইব। ইহার জন্য যদি আমি সর্ব্বস্বান্ত হই, তাহাও স্বীকার। বিবাহের কথা শুনিয়া যোগেশ্বর কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলেন। তাহার পর, তর্কালঙ্কার মহাশয় সপ্তাহের মধ্যে বহু কষ্টে, ও বহু ব্যয়ে, যোগেশ্বরের বিবাহ দিয়া বাটীতে পাঠাইলেন, ও তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা ভয় মিত্রতা দেখাইয়া চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে সাড়ে তিন শত টাকা আদায় করিলেন। প্রায় এই রূপেই বংশজদিগের ‘ উত্রা ’ পরিবর্ত্ত দ্বারা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ জাতিরাই সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট। বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহাঁদিগের সমতুল্য জাতি ভারতে নাই বলিলেই

হয়। ব্রাহ্মণেরাই শাস্ত্রকর্ত্তা; তাঁহারা যাহা বলেন ও যাহা করেন, আমরা প্রায়ই তাহা বলিয়া থাকি ও করিয়া থাকি। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ব্রাহ্মণ জাতির প্রভাব কমিয়া আসিয়াছে, তথাপি, আমাদিগের শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক মতের প্রায়, সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ জাতির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ উৎকৃষ্ট জাতির মধ্যেও বিবাহ পদ্ধতি যৎপরোনাস্তি কুৎসিত হইয়া রহিয়াছে। আমি এতৎ সম্বন্ধে যত দূর সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদায় লিখিতে হইলে, এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তকেও শেষ হইবে কি না সন্দেহ; এই জন্য, ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণিত হইল, সহৃদয় পাঠক মহাশয়েরা সেই সমুদায় সত্য বলিয়া জানিবেন; ইহাতে একটিও অলীক কথা লিখিত হয় নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতির নিকট বিদায় লইয়া এতদ্দেশীয় অন্য অন্য জাতির বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে তৈলিক, তাম্বুলী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার এবং আভীর অর্থাৎ গোয়ালা প্রভৃতি জাতির পঞ্চাশ ষাট টাকার মধ্যে বিবাহ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইত। বিবাহ রাত্রিতে বরযাত্রীদিগকে অন্ন ভোজন করাইলেই চলিত, এবং কন্যাকে দশ বার ভরি রৌপ্যের আভরণ দিতে পারিলেই বরকর্ত্তা এক জন সম্পন্ন লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। ঐ সকল জাতির মধ্যে যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব, বার মাস সম ভাবে উদরান্নের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিত না, তাহাদিগের দুই তিনটি কন্যার বিবাহে বিপদ উপস্থিত হইত। কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষা

বরকর্ত্তার অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে, কন্যাকর্ত্তা বিবাহ সম্বন্ধে এই রূপ প্রস্তাব করিত,—বৈবাহিক মহাশয়, আমার অবস্থা বড় মন্দ, আমি এ বিবাহে একটি পয়সাও খরচ করিতে পারিব না। আপনাকে 'দোমুড়ো' চালাইয়া আমার মেয়েটি গ্রহণ করিতে হইবে। দোমুড়ো শব্দের অর্থ এই যে, বিবাহে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে যে কিছু অর্থ ব্যয় হয়, তৎসমুদায় বরকর্ত্তা দিয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা বিবাহ বাসরে কন্যা উপস্থিত করিয়া দিতে পারিলেই সকল বিষয়ে অব্যাহতি পাইত। কন্যা বিক্রয় করা যে মহা-পাতক, ইহা বংশজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শূদ্র জাতিরা বিশেষ বুঝিত। এই জন্য, উপরি উক্ত কয়েকটি জাতির মধ্যে প্রায়ই কন্যা বিক্রয় হইত না ; তবে যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব, যাহারা উদরান্নের জন্য লালায়িত, তাহারাই কুড়ি পঁচিশ টাকা পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিত। যেমন কাল প্রভাবে আহার পরিচ্ছদ আভরণাদির দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুখময়ী কলিকাতা মহানগরী হইতে সভ্যতার প্রবল স্রোত বঙ্গদেশের চতুঃপার্শ্বে উথলিয়া পড়িতেছে, সেই সঙ্গে বিবাহের বাহ্যাড়ম্বরও পল্লীগ্রামে দিন দিন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। যে কৃষিজীবী লোকেরা কিছু কাল পূর্ব্বে বরযাত্রীদিগকে অন্ন ভোজন করাইয়া পার পাইত, রাঙ্গা শাড়ী ও দুই জোড়া শঙ্খ দিয়া কন্যা দান করিলেই যথেষ্ট মনে করিত, এক্ষণে সেই সকল কৃষীবল লোকের বাটীতে বিবাহের আড়ম্বর দেখিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ কাল আর কৃষিজীবিগণ বরযাত্রে আসিয়া ডাল ভাত খায় না ; তাহাদিগকে লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইতে হয়। পাঁচ ছয় ভরি সোণার গহনা না দিলে, কৃষক কন্যাকর্ত্তা আর কন্যা পার করিতে পারে না। পক্ষান্তরে,

বর প্রায় চৌপালায় চড়িয়া ইংরাজী বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে বিবাহ করিতে আসে। যে সকল কৃষক সূর্য্য উদয় হইতে দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রচণ্ড রৌদ্রে হল চালনা করে, তাহারও বিবাহ রজনীতে যথাসাধ্য শুভ্র বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বরযাত্রী সাজিয়া কন্যাকর্ত্তার বিবাহ সভা উজ্জ্বল করিয়া থাকে। এক কৃষীবল লোকের বিবাহের আড়ম্বর দেখিলেই পল্লীগ্রামের উন্নত জাতির বিবাহে যে কত দূর আড়ম্বর হইয়া উঠিতেছে, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই কলিকাতা মহা-নগরী পল্লীগ্রামবাসীদিগের সকল বিষয়েরই শিক্ষাদাত্রী; অর্থাৎ, সহর যে ভাব ধারণ করে, মফঃস্বলবাসীরা তাহার অনুকরণ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, তৎসমুদয়াই পল্লীগ্রামের ভাব; নগরের কথা ইহার মধ্যে প্রায় কিছুই বর্ণিত হয় নাই। এক্ষণে কলিকাতা মহানগরীর অন্যূন বিংশতি বর্ষের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কি রূপ তারতম্য ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কলিকাতার সাধারন লোক অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়; অর্থাৎ, কি পরিচ্ছদ, কি আহার ব্যবহার, কি ক্রিয়া কাণ্ড সমস্ত বিষয়েই আপনাদিগের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোক ধনবান্ লোকের অনুকরণ করিয়া থাকেন। এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে পিরিলী মহাশয়েরা, শোভাবাজারের রাজো-পাধিধারী কায়স্থ সম্প্রদায়, শেঠ বসাক বাবুরা ও কয়েক ঘর সুবর্ণবণিক্ প্রকৃত বনিয়াদী বড় মানুষ। বিশেষতঃ, প্রাচীন-লোকের প্রমুখাৎ শুনা যায় যে, অত্র নগরীর দুই চারি ঘর সুবর্ণ

বণিককে তৎকালের লোক 'ধনকুবের' বলিতেন। তাঁহারা সকলেই সাত্ত্বিক ভাবের লোক ছিলেন ; ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহা-দিগের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তৎকালের লোকের অধিক ধন হইলেই আপনাদিগের মান মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। নিজ নিজ কন্যাগুলিকে সদ্বংশ জাত গুণবান্ পাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিতে সকলেই প্রয়াস পাইতেন। এক্ষণ-কার অপেক্ষাও তৎকালে দলাদলি ঘোঁটের আধিক্য ছিল। অন্যের অপেক্ষা আমাদিগের দলে বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জনেরা অধিক পরিমাণে থাকিবেন, ও উচ্চ বংশীয়দিগের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া আপনাদিগের দলভুক্ত করিয়া রাখিব, এই আশয়ে এক একটি কন্যার বিবাহে তাঁহারা বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। অধিক ব্যয় করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল যে, ধনাঢ্য সুবর্ণ-বণিক্ জাতির অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সমাজ ; এক্ষণকার অপেক্ষা পূর্ব্বে আরও সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ ও মর্য্যাদাশালী, তাঁহাদিগের পুত্রগণের সহিত আপন আপন দুহিতৃগণের বিবাহ দিতে অনেকেই ব্যগ্র হইতেন। যেমন পণ্যবীথিকার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য আসিলে, বহুসংখ্য ক্রেতা একত্র হইয়া তাহার মূল্য বাড়াইয়া দেয়, সেই রূপ ধনবান্ অথচ উচ্চ বংশীয় ব্যক্তির পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া উচ্চ বংশীয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিব, এই আশয়ে একটি পাত্রের উপর দশ জনের লক্ষ্য থাকিত। তদ্দর্শনে সেই পাত্রের পিতা গরম হইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রকাশ্যে বলুন বা না বলুন, কার্য্য গতিকে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন যে, যিনি অধিক অর্থ দিতে পারিবেন, তাঁহার কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহ দিব।

পাঠক মহাশয়, বোধ করুন, এক জন আধুনিক ধনী স্বুবর্ণ-বণিক্ সেই প্রকার বনিয়াদী মর্য্যাদাবান্ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করণ মানসে তাঁহার নিকট আপনার পুরোহিত পাঠাইলেন। পুরোহিত গিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমাদিগের বাবু তাঁহার এক মাত্র কন্যার বিবাহ দিতে নিতান্ত অভিলাষী। কি রূপ মর্য্যাদা পাইলে, আপনি তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে পারেন, তাহা বিশেষ রূপে জানিবার জন্য তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। পুরোহিতের মুখে এই কথা কয়েকটি শুনিয়া বনিয়াদী ধনী গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—আমার পুত্রের নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে; বিশেষতঃ, অমুক বাবু পাঁচ শত ভরি সোণা, দুই হাজার ভরি রূপা ও পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিতে সম্মত আছেন, আমি তাহাতেও স্বীকৃত হই নাই। এই সকল কথা শুনিয়া পুরোহিত আশ্চর্য্য হইলেন, কি বলিয়া যে তাঁহার সে কথার উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বনিয়াদী বাবুকে কহিলেন,—মহাশয়, আপনি হঠাৎ কাহাকেও পাকা কথা দিবেন না, আমি এক বার আমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কত দূর পর্য্যন্ত দিতে পারেন; তাহার পর, আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিবেন। এই কথা বলিয়া পুরোহিত সে দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার যজমানের বাটীতে আসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করাতে, আধুনিক ধনী বলিলেন,—আপনি ইহাতেই ভয় পাইয়াছেন! তাঁহার আশয় এই পর্য্যন্ত বই ত নহে? আমার পুত্র সন্তান নাই, যাহা কিছু বিষয় বিভব আছে, মৃত্যু কালে সেই সমস্ত কন্যাকেই দিব।

তাহা এক্ষণেই দি, কি ইহার পরেই দি, সে একই কথা। আপনি কল্য পুনর্ব্বার যাইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, পাঁচ শত ভরি সোণা, দুই হাজার ভরি রূপা তিনি ত দিতে প্রস্তুতই আছেন; এতদ্ভিন্ন, তিনি তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিবেন। কালে এই কন্যা বাবুর সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন; যেহেতু, বাবুর পুত্র সন্তান নাই। আপনি যে ঘরেই পুত্রের বিবাহ দিউন না কেন, আমার বাবু জামাতাকে যেরূপ যৌতুক দিবেন, এরূপ যৌতুক দেওয়া কাহারও ক্ষমতায় হইবে না।

বরকর্ত্তা পুরোহিতের নিকট যে সকল কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া ছিলেন, তৎসমুদায়ই অলীক; আপনার পুত্রের দর বাড়ান ভিন্ন সেই কথায় সত্যের লেশ মাত্রও ছিল না। এই রূপ অসত্য কথাতেও কন্যাকর্ত্তা ভয় না পাইয়া পুরোহিতকে অধিক প্রলোভন যুক্ত কথা কহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পুরোহিতও সেই সকল কথায় অলঙ্কার দিয়া অতি সুন্দর রূপে বলাতে, বরকর্ত্তা মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এরূপ শীকার হঠাৎ মিলিবে না। ইহার পূর্ব্বে যে সকল লোক সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তিন সহস্র মুদ্রার উপরে কেহই উঠিতে পারে নাই; তদপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে পণ দিতে এ ব্যক্তি আপন মুখেই স্বীকৃত হইয়াছে। আমি সাহসে ভর করিয়া যদি আর একটু মোড় দিতে পারি, তাহা হইলে, আরও কিছু অধিক হইতে পারে; কিন্তু সেটা সৌজন্যের উপর লওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। অধিক পীড়াপিড়ি করিলে, যদি শীকার হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে, এ আক্ষেপ মরিলেও যাইবে না। এই রূপ

চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে পুরোহিতকে কহিলেন,—মহাশয়,আপনি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ; বোধ হয়, এরূপ বিবাহ আপনি কত শত দেওয়াইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট অধিক কথা কহা, আমার ধৃষ্টতা মাত্র। যে মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার পুত্রের শুভ সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমার নিকট কোনও অংশেই অপরিচিত নহেন ; তাঁহার সহিত কুটম্বিতা করিতে বহু কালাবধি আমারও অভিলাষ আছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, ভগবান্ তাহাই ঘটাইয়া দিলেন ; তবে যে একটা পাওনা থোও-নার কথা উত্থাপিত হইতেছে, সেটা কেবল গৃহিণীর অভিমান সুখের জন্য। আমার ছেলে এত টাকা পাইয়া বিবাহ করিয়াছে, পাঁচ জনের কাছে এই কথা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিবেন, এই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ; নতুবা, বিবাহ কার্য্যে মোড় দিয়া কি ভদ্র লোকে টাকা লইতে পারে ? বিশেষতঃ, আজ হইতেই তাঁহাকে 'বৈবাহিক মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। বৈবাহিক মহা-শয় যাহা কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে সকল কাহাকে দিবেন ? আমাকে দিবেন, না আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবেন ? আপনার ঝী জামাইকেই দিবেন। গোস্বামী প্রভুদিগের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, পূর্ব্ব কালে রাজা রাজড়ারা বিবাহের সময়ে কন্যাকে এরূপ যৌতুক দিতেন যে, সেই ধনে রাজদুহিতৃগণ চির কাল স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। পিতৃদত্ত সম্পত্তিতে তাঁহারা যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি-তেন, স্বামী কি শ্বশুর সে বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারিতেন না। মহাশয়, বাপের বাড়ীর আদরেই শ্বশুর বাড়ীর আদর। যে মেয়ে দশ খানা হীরার গহনা পরিয়া শ্বশুর বাড়ী

আসেন, শাশুড়ী ননদের কাছে তাঁহারই বিশেষ আদর হয়। মহাশয়, একটা নাম করুন দেখি যে, কোনও কালে লক্ষ্মীছাড়ার মেয়ে বড়মানুষের ঘরে পড়িয়াছে কি না? উপস্থিত বিবাহ সম্বন্ধে আমি আর কোনও কথাই বলিতে চাই না; তিনি যাহা দিবেন, তাহাই বহুমানে মাথা পাতিয়া লইব। তবে কি না বাড়ীর ভিতরকার গোটাকতক কথা তাঁহাকে শুনিতেই হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া পুরোহিত কহিলেন,—মহাশয়, আমাদিগের বাবু এক জন ক্রিয়াবান্ লোক; বিশেষতঃ, কন্যাটি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের। সেই কন্যার বিবাহ দিবার সময় তিনি কিছু মাত্র মনের ক্ষোভ রাখিবেন না। ভাল, আপনিই বলুন দেখি, কন্যাকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে কোন্ বড় মানুষ একাল পর্য্যন্ত সক্ষম হইয়াছেন? এই জন্য বলিতেছি, আপনি ইহাতেই সম্মত হউন, আমার বাবুর সহিত কুটুম্বিতা করিয়া আপনি যৎপরোনাস্তি সুখী হইবেন, আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। পুরোহিতের এই কয়েকটি কথা শেষ হইলেই বরকর্ত্তা তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্মতি দান করিলেন। পরে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই রূপে মেয়েটি যথেষ্ট যৌতুক লইয়া শুভ ক্ষণে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলেন; তদ্দৃষ্টে বরকর্ত্তার জ্ঞাতিবর্গ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পুরুষেরা অনেক পরিমাণে মনের ভাব মনে রাখিতে পারেন; কিন্তু এদেশীয় অশিক্ষিতা নারীগণ জ্ঞাতির মঙ্গল দেখিলে, অকারণ দিন যামিনী হিংসানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। যেখানে হিংসার আধিক্য, সেই খানেই মাৎসর্য্যের আবির্ভাব।

বর্ণিত বরপাত্রের পিতা দত্তোপাধিধারী; 'চার ক্ষীর চব্বিশ ক্ষেণী সন্তোষ' পাইয়া থাকেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া নগদে জিনিষে এবং আভরণে প্রায় পনর সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায়, তদীয় সহধর্ম্মিণী অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। পুত্রবধূর পাকস্পর্শের দিন জ্ঞাতিবর্গের ঝী বৌ সকলেই নিমন্ত্রণোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হওয়ায়, পুত্র যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ও আভরণাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদায় সকলকে দেখাইতে লাগিলেন। দর্শকেরা মুখে 'বেশ হইয়াছে! বেশ দিয়াছে!' বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সে যাহা হউক, বর কর্ত্তার পুত্র বিবাহ করিয়া যে পরিমাণে যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কেহই আর সে পরিমাণে প্রাপ্ত হন নাই। দত্ত বংশীয়েরা প্রথমতঃ এই রূপ যৌতুক পাওয়ায়, সমস্ত দত্ত পরিবারের সেই রূপ যৌতুক পাইবার দিকে লক্ষ্য রহিল। পরস্পর বলাবলি আরম্ভ করিলেন যে, "আমাদিগের বংশের এক জন যখন এরূপ উচ্চ যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন ইহার কমে আমরা যদি স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দি, তাহা হইলে, আমাদিগের মানের হানি হইবে।

পূর্ব্বে ধনাঢ্য হিন্দুগন প্রায়ই ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া এবং কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া দল বৃদ্ধি করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এক্ষনকার লোকের রুচির সহিত তাঁহাদিগের রুচির বিলক্ষণ তারতম্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছি, পল্লীর মধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি মহাসমারোহের সহিত দোল দুর্গোৎসব করিতেন, তবে তৎপর বৎসরে পল্লীর আর দশ জন

প্রতিবেশীর ন্যায় দোল দুর্গোৎসব করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, ভাল কার্য্যেই হউক, বা মন্দ কার্য্যেই হউক, সকল সময়েই আমাদিগের দেশের লোক নিতান্ত অনুকরণপ্রিয়। কি গ্রামস্থ, কি পল্লীস্থ কিম্বা এক বংশের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি একটি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, কি ধনী কি দরিদ্র সমস্ত লোকেই সেই কার্য্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই কথার সত্যাসত্য সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি একটি দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ;—

বরাহনগর হইতে হালিসহর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় কূলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নৌকারোহণে গমন করিলে, বহুসংখ্য বাঁধাঘাট ও দ্বাদশটি করিয়া শিব মন্দির প্রায়ই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। সেই সকল কীর্ত্তিগুলি আধুনিক নহে ; এক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য প্রায় আর হইতেছে না, ভবিষ্যতে আর হইবে কি না সন্দেহ। এই কলিকাতা নগরের মধ্যে ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক্ মহাশয়েরা প্রায় অনেকেই এক একটি ঠাকুর বাটী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এবং প্রাচীন ধনবান্‌গণের অনুমতি ক্রমে এক্ষণেও দুই একটি ঠাকুর বাটী প্রস্তুত হইতেছে ; কিন্তু বোধ হয় যে, সে রূপ কীর্ত্তি ভবিষ্যতে না হওয়াই সম্ভব ; কারণ, এক্ষণকার লোকের রুচি স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এই কয়েকটি প্রাচীন কীর্ত্তির কথা এ স্থলে উল্লেখ করার বিশিষ্ট কারণ এই যে, অত্র নগরের এক জন নূতন ধনবান্ ব্যক্তি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সম্ভ্রান্ত দত্ত বংশীয়দিগের ঘরে আপনার দুহিতার বিবাহ দেওয়ায়, তৎকালের অন্যান্য আধুনিক ধনীরাও তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহা-

দিগের মনে এই রূপ ধারণা হইল যে, অমুক ব্যক্তি আমাদিগের অপেক্ষা ধনে ন্যূন হইয়াও যখন বরকে রূপার দান সামগ্রী, হীরার বালা, মুক্তার মালা, হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি বরাভরণ, এবং কন্যাকে পাঁচ শত ভরি সোণার গহনা ও দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ যৌতুক দিয়া বিবাহ দিল, তখন আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আপন আপন দুহিতার বিবাহ দিতে হইবে। যে দত্তবংশীয়দিগের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া অমুক ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করিয়া বেড়াইতেছে, আমরা অবশ্যই তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। এই রূপ চিন্তা করিয়া নিত্যানন্দ পাল নামক জনৈক ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক্ পূর্ব্ব কথিত দত্ত বংশীয়দিগের জ্ঞাতির গৃহে মহাসমারোহের সহিত আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বর এবং কন্যার দুই বাটীতেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। সেই সময় এক দিন রজনী যোগে অদ্বৈত দত্তের সহধর্ম্মিণী (বরের মাতা) পতিকে কহিলেন,—তোমাকে একটি কথা বল্‌চি; এ কথাটি কিন্তু রক্ষা কত্তেই হবে। বড়্‌কীর ছেলে বিয়ে করে খুব পেয়েছিল বলে, তার দর্পে দত্তপাড়া কেঁপে গিয়েছিল। লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বল্‌ত,—আমার ছেলে বিয়ে করে যেমন পেয়েছে, তেমন কেউ পায়ও নি, পাবেও না! মাগীর দম্ভ দেখে আমার হাড়ের ভিতর জ্বালা কোত্তো। এখন যাই হরি মুখ তুলে চাইলেন, তাই মনের কালী গেল। দেখ, এই বিয়েয় আমি নূতন কুটুম্বর সঙ্গে একটি নতুন খেল খেল্‌বো। এতে দশ টাকা খরচ হবে, কিন্তু এর পর দেখ, কাণে জল দিয়ে জল বার করার মত আমি আরও টাকা নিতে পারি কি না! অদ্বৈত বাবু গৃহিণীর এই আবৃ-

দারের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—তোমার ছেলের বিয়েয় তুমি যা কোর্ব্বে, তাতে কি আমি অন্য মত কত্তে পারি? পতির আদেশ পাইয়া তৎপর দিন হইতে বরের মাতা নূতন প্রণালীর 'গাএ হলুদ' পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে গাত্র হরিদ্রার শুভ দিন সমাগত হইল। গৃহিণী প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার দাসীকে আদেশ করিলেন,—আমা-দিগের জ্ঞাতি কুটুম্বের বাটীতে যার যত দাস দাসী আছে, সকল-কেই ডাকিয়া আন, তাহাদিগকে 'গাএ হলুদ' বহিতে হইবে। আদেশ মাত্রেই দাসী হাস্যবদনে সকলের বাটী বাটী সংবাদ দিয়া আসিল। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই পাল বাবুর অন্তঃপুরের অঙ্গন পাঁচ বাটীর কিঙ্কর কিঙ্করীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দত্ত মহিলা নানা দ্রব্য পরিপূরিত দুই দুই খানি করিয়া থালা সকলের হস্তে তুলিয়া দিলেন; তাহারা রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাল বাবুদিগের ভবনাভিমুখে চলিল। দাস দাসীদিগের অগ্রে অগ্রে দধি এবং মৎস্যের পঞ্চাশটি ভার স্কন্ধে লইয়া বেহারারা চলিতে লাগিল। নূতন ধরণের 'গাএ হলুদ' আসিতেছে দেখিবার জন্য পাল বাবুদিগের প্রতিবেশীরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। বৌ ঝীরা ছাদের উপর হইতে এবং গবাক্ষ ও দ্বার দিয়া উঁকি ঝুকি মারিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সমস্ত লোক পাল বাবুর বাটীর ভিতর যাওয়ায়, তাঁহার সদর ও অন্দর বাটী লোকারণ্য হইয়া পড়িল। দধি মৎস্যের ভার বাহকেরা বহির্ব্বাটীর অঙ্গনে দধি মৎস্যের ভার নামাইয়া বিদায়ের প্রত্যাশায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যান্য দ্রব্য বাহিকা দাসীরা অন্দরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি দেখিয়া পাল বাবুর গৃহিণী আহ্লাদে

স্ফীত হইয়া উঠিলেন। দত্ত বাবুদিগের বাটীর প্রধানা দাসী গৃহিণীকে দ্রব্য সামগ্রী বুঝাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিল,—মা, আপনি সমস্ত সামগ্রী বুঝিয়া লউন;—এই মসলা ও পাণ স্নপারীর বার খানা এবং সন্দেশ মিঠাইএর দশ খানা থাল; এই পরমান্নের দুধ এক কলসী, পরমান্নের চিনি এক ধামা; এই মাজুরট পাতিয়া ও এই রাঙ্গাপেড়ে কাপড় খানি পরিয়া কন্যা গাএ হলুদ মাখিবেন; এই রূপার বাটীতে হলুদ তেল আছে; রূপার কাজলনাতা, বেসম, ময়দা, ইটে, মাথাঘসা, আলতা, আরশি, চিরণী, মালা, ঘুন্সী, জরি, ফিতে, ল্যাবেণ্ডার, আতর, গোলাব, ফুললতেল এই চারি খানি থালায় সাজান আছে, দেখিয়া লউন; এই জলচৌকি, ঘড়া, গামলা, ঘটী, ডাবর, গামছা, টোয়ালে; কন্যার স্নান হইলে, এই গালিচায় বসিয়া চুল বাঁধিবেন; তাহার পর, বারাণসী শাড়ী পরিয়া আইবড় ভাত খাইবেন। প্রধানা দাসী এই রূপে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বুঝাইয়া দিয়া আপনাদিগের বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

দাস দাসীগণ বিদায় হইয়া গেলে, পাল বাবু আপনার গুরু পুরোহিত ও বান্ধবদিগের বাটীতে দধি মৎস্য পাঠাইয়া দিলেন। যাঁহারা যাঁহারা তৎকালে বাবুর বাটীতে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এই রূপ দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বাবুর নৈকট্য জ্ঞাতিগণ এই নূতন ধরণের 'গাএ হলুদের' কাণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—আমার ছেলের বিবাহে এই রূপ পাঠাইতে হইবে। গাত্র হরিদ্রার পর দিন সন্ধ্যার পর দত্ত বাবুদের বাটী হইতে কন্যার গহনা ও রজত নির্ম্মিত নানা-

বিধ খেলনা এবং নানা রকমের বস্ত্র কন্যার বাটীতে গিয়া পঁহুছিল। সেরূপ কাণ্ড পূর্ব্বে আর কেহ কখনও করেন নাই। পাঠক মহাশয়, এই গাত্র হরিদ্রা ও অধিবাসের নূতন প্রণালী বোধ করুন, দত্ত বাবুদিগের বাটী হইতেই প্রথম সৃষ্ট হইল। তৃতীয় দিনে মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। পর দিন রজনী অষ্ট ঘটিকার সময় পাল বাবু বর কন্যা বিদায় করিলেন। যখন শুভ ক্ষণে শ্বশুরালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মহাপাল হইতে কন্যা ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন, সেই সময় পূর্ব্ব হইতে পাঁচ বাটীর মেয়ে ছেলে অন্দর মহলের উঠানে একত্র হইয়াছিল। কন্যা দেখিয়া তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—আহা! বাপের বাড়ী থেকে মেয়ে যেন গহনা পরে রামগাছ হয়ে এসেচে! বড় বাবুর বৌ অনেক গহনা পরে এসেছিল সত্য, কিন্তু এর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। চারি দিক্ হইতে এই রূপ সুখ্যাতির ধ্বনি উঠায়, বরের মাতা আহ্লাদে আট খানা হইয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। বড় বাবুর গৃহিণীও তৎকালে এ বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বধূ অপেক্ষাও নূতন বধূ উৎকৃষ্ট গহনা পরিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মন একেবারে ছাই হইয়া গেল, আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, একটা ছল করিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দিনে পাল বাবুর সহধর্ম্মিণী ফুলশয্যা পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ভিন্ন পঞ্চাশ খানি অতিরিক্ত থালায় ফল মূল, সন্দেশ মিঠাই, পান ও পাণের মসলা পাঠাইব স্থির করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাল.

বাবুর বাটী হইতে ফুলশয্যার ভার বাহির হইতে লাগিল। মসলার মধ্যে খএরের প্রস্তুত বাটী, ঘর, দালান, হাতী, ঘোড়া, শয্যা, ও বিবিধ প্রকার গহনার প্রতি রাজপথের দর্শকগণের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ফল মূল ও সন্দেশের থালা অসংখ্য; তাহার পর, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পিত্তল কাঁসার বাসন, দানের রূপার বাসন, রূপার খাট ও তদুপযুক্ত শয্যা; মেহগ্নির খাট ও ভাল বিছানা; আল্‌মারি, দেরাজ, চৌকি, লোহার সিন্ধুক, আয়না, ঝাড়, লণ্ঠন, শেজ, নানা প্রকার ছবি ও দুলিচা, গালিচা, কার্‌পেট ইত্যাদি। অবশেষে, দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট শুভ্রবর্ণ বাজী যোজিত এক খানি সুন্দর ফিটন গাড়ী সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। লোক পরম্পরায় দর্শকেরা শুনিল যে, এই গাড়ী ঘোড়া পাল বাবুরা জামাতাকে যৌতুক দিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দত্ত বাবুর পুত্র বিবাহ করিয়া এক জন বড় মানুষের সংসার সাজাইতে যেরূপ দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইয়াছিলেন। যদি দুই পাঁচ হাজার বাহকের এক খানি বসত বাটী বহন করা সম্ভব পর হইত, তবে বোধ হয়, দ্রব্য সামগ্রীর সহিত সে রূপ এক খানা বাটী দিতেও পাল বাবু কৃপণতা করিতেন না।

যেমন গুপ্তীপাড়ার পূজা বঙ্গ দেশের বারইয়ারি পূজার আদর্শ হইয়াছে, বেলতলার বাবুদিগের সখের যাত্রা সংক্রামক হইয়া দিন কতক এ দেশীয় অল্প বয়স্ক বালকদিগের পরকাল খাইয়াছিল, হিন্দুকালেজের কয়েক জন যুবক ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া হোটেলে খানা খাওয়ার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, যেমন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং পরি-

শেষে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর এতদ্দেশীয়গণের বিলাত গমনের পথের কণ্টক তুলিয়া দিয়াছিলেন, যেমন রামকানাই কর্ম্মকার এবং তৎপরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অবোধ হিন্দু বালকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথদর্শক হইয়াছিলেন, যেমন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাগণের বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরাজ্যের ঘর ঘর ও পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রী শিক্ষার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, সেই রূপ এই দত্ত বাবুদিগের বাটীর দুইটি সমারোহের বিবাহের আদর্শ লইয়া ধনাঢ্য বণিক্‌কুল কন্যা পুত্রের বিবাহে অপরিমিত ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দত্ত বাবুদিগের দুই পুত্রের বিবাহ প্রণালী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত উদ্বাহ তত্ত্বের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। ঐ দুই বিবাহের পর, অন্য কোনও নূতন বিবাহের কথা বার্ত্তা উপস্থিত হইলেই ধনাঢ্য অথচ সম্ভ্রান্ত বরের পিতা দত্ত বাবুদিগের পাওনা থোওনার নজীর দেখাইতেন। যাঁহারা কন্যার বিবাহের জন্য ভাল ঘর ও বর খুঁজিয়া থাকেন, পূর্ব্ব কথিত দুই বিবাহের পর অবধি তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। সম্ভ্রান্ত ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে অনেকেই সাহস করিতে পারিলেন না; তবে বড়য় বড়য় তুমুল সংগ্রাম প্রায়ই চলিতে লাগিল। দত্ত বাবুদিগের বাটীর বিবাহ যদিও আদর্শ স্থল হইয়াছিল, কিন্তু বাটীর গৃহিণীদিগের কল্পনা শক্তির প্রভাবে দিন দিন বিবাহ কার্য্যের দান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অত্র নগরের কোনও ধনবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব কথিত দুই বিবাহের অপেক্ষাও অধিক ব্যয় করিয়া কোনও রাজোপাধিধারীর

গৃহে আপনার কন্যার বিবাহ দিলেন। সেই বাটীর গৃহিণীর মহাকবি মিল্টন অপেক্ষাও প্রখরা কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি কল্পনা করিলেন যে, জামাতাকে হাতে খাওয়াইবার দিন সোণার থালে ভাত খাওয়াইব। সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় জামাতা ও তাঁহার তিন চারি সহোদরকে হাতে খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সহোদরগণ পরি-বেষ্টিত হইয়া জামাতা আহার করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ভোজনের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। সেই চারিটি ভোজনের স্থানে এক এক খানি সোণার থাল, পাঁচ পাঁচটি সুদৃশ্য সোণার বাটী, ও সুন্দর শিল্পকার্য্য যুক্ত এক একটি সোণার গ্লাস দেওয়া হইয়াছে। জামাতার সহিত বহুসংখ্য কুটুম্ব বান্ধব ভোজনে বসিয়াছিলেন, হাতে খাওয়ানর এই প্রকার আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

কোনও মধ্যবিধ ধনবানের গৃহিণী নিম্ন লিখিত মতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আম সন্দেশের 'উভল' পাঠাইয়াছিলেন; যথা—একটি বড় পিত্তলের কলসী, একটি প্রকাণ্ড পিত্তলের গামলা, একটি পিত্তলের বড় ঘটী, রজত নির্ম্মিত এক খানি সালবোট রেকাব ও রজত নির্ম্মিত এক খানি ছুরি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জামাতা এক কলসী জল দিয়া গামলায় আম্র ধৌত করিয়া লইবেন, সেই আম্র ধৌত করিবার সময় জল ঢালিয়া লইবার জন্য বড় ঘটীর প্রয়োজন হইবে; তাহার পর, রজতময় ছুরিকা দ্বারা আম্র ছাড়াইয়া রজত নির্ম্মিত সালবোট রেকাবে রাখিয়া ভক্ষণ করিবেন। পক্ষান্তরে, অন্য এক গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন যে, আমার কন্যার বিবাহের সময় জামাতাকে উচ্চ মূল্যের

সোণার ঘড়ী ও হীরার চেন দিয়া কুটুম্ব বান্ধবগণকে চমকাইয়া দিব। গৃহিণীর যখন এরূপ সাধ হইল, তখন কর্ত্তাও সেই সাধের বশীভূত; সুতরাং সেই রূপ সাধই বিবাহ কালে কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল।

পাঠকগণ, কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্র-কারেরা কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিতে গেলে, নিদান পক্ষে দশ বৎসরের মধ্যে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু পুরুষের পক্ষে তৎ-সম্বন্ধে কোনও নিয়মই নাই। পুরুষে দশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে, অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধেরও বর সাজিতে বারণ নাই, আবার চির কাল কৌমার অবস্থায় থাকিলেও তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় না। পুরুষের পক্ষে এই সকল সুবিধা থাকাতেই বরের পিতার নিকট কন্যার পিতাকে চির কালই হাতযোড় করিয়া আসিতে হইতেছে। কন্যাটি নবম বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেই তাহার পিতাকে জগৎ শূন্যময় দেখিতে হয়; কেমন করিয়া কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিবেন, এই চিন্তাতেই দিন যামিনী নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কন্যাগণের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, ধনবান্ লোকেরা পাত্রের অনু-সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হন; এক একটি কন্যার বিবাহে তাঁহারা অম্লান বদনে পাঁচ সাত হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেই রূপ ব্যয় ভূষণ করিয়া কন্যা-দান করিবেন, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত কার্য্য। পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরা কালের রাজরাজেশ্বরেরা এক একটি কন্যার বিবাহে জামাতাকে বহুসংখ্য হয়, হস্তী, দাস,

দাসী এবং রাজ্য পর্য্যন্তও যৌতুক দিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁহাদিগের অনুকরণ করিত না। বিবাহে বিপ্লব কোন্ সময় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, স্থানান্তরে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ, সুবর্ণবণিক্ সমাজের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতে কন্যার বিবাহ লইয়া হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে। স্বজাতির কষ্ট দূর করণ মানসে সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের শিরোরত্নগণ এই দোষাকর সামাজিক রীতি এবং ব্যবহারের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে সুবর্ণবণিক্ হিতসাধিনী নাম্নী একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। কথিত সভার সভাপতি এবং সভ্যগণ কন্যার বিবাহে কুরীণ চুক্তি উঠাইয়া দিবার জন্য দুই তিন বৎসর কাল কায়মনে যত্ন করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। চির কালই এ দেশে শাস্ত্রাপেক্ষা ব্যবহারের অধিক আদর দেখিতে পাই। আর্য্য জাতির বিবাহ সম্বন্ধে মনু যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায় লোপাপত্তি প্রায় হইয়াছে। কিছু পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উদ্বাহতত্ত্ব গ্রন্থে স্ত্রীপুরুষকে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল নূতন মত বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় লোপাপত্তি পাইয়া যাইতেছে। আদ্য মূল উদ্বাহতত্ত্ব পাঠ করিলে, দেখা যায় যে, বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে কতকগুলি অতি সুন্দর নিয়মে করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কুলক্ষণা কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য পদে পদে নিষেধ

করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে, কি রূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত, তৎসম্বন্ধেও অনেক সুন্দর নিয়ম আছে। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বিবাহ দিতে হইলে, শত করা এক যোড়া বর কন্যার মিলন হওয়াও কঠিন হইয়া পড়ে। যে স্থানে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থানেই শাস্ত্রের অবমাননা হইয়া থাকে।

পাঠক মহাশয়, বোধ করুন, কোনও মধ্যবিধ লোক কোনও ধনী সন্তানের সহিত আপনার দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য শুভ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটি কুলে শীলে, ধনে মানে সর্ব্বাংশেই সুন্দর, কন্যাটিও পরমা সুন্দরী ও সুশীলা। এই বিবাহে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়েই ব্যগ্র হইয়াছেন, কিন্তু কোষ্ঠী দেখিবার সময়ে প্রকাশ হইল যে, কন্যাটির রাক্ষসগণ ও পাত্রের নরগণ। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, রাক্ষসে ও নরে মিলন হইলে, কন্যা বিধবা হয়। এই কথা শুনিয়া কন্যাকর্ত্তা একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন যে, এ কোষ্ঠী খানা লুকাইয়া ফেলিয়া এক খানা নূতন কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া রাখি; কাজে তাহাই করিলেন। কন্যার রাক্ষসগণের কথা শুনিয়া কন্যার মাতা আপন পতিকে কহিলেন,—এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দাও, ধনবানের গৃহে মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ; কিন্তু মেয়ে যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের ধন রত্নে আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে? চির কাল হাতের লোহা থাকে, এমন চেষ্টা কর। কন্যাকর্ত্তা সহধর্ম্মিণীর কথা শুনিলেন না, কেবল এক মাত্র ধনের লোভে আপন কন্যাকে সেই বরে ন্যস্ত করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে কন্যাটি বিধবা হইয়া দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে লাগিল।

এক্ষণকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত (?) পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রিয় মহাশয়েরা যাহাই বলুন না কেন, শাস্ত্রের প্রতি হিন্দুজাতির অনাদর হইয়া পড়ায়, ভিতরে ভিতরে যে তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। জ্যোতিষবেত্তারা বর কন্যার গণ সম্বন্ধে এই রূপ নিয়ম অবধারিত করিয়া গিয়াছেন; যথা—নরে নরে, দেবে দেবে এবং রাক্ষসে রাক্ষসে যে মিলন হয়, তাহাকে উত্তম মিলন কহা যায়। আর নরে দেবে মধ্যম ও নরে রাক্ষসে যে মিলন হয়, তাহাকেই জ্যোতিষবেত্তারা অধম মিলন কহিয়া থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, দেবে রাক্ষসেরও মিলন অনিষ্টকারী হয় না। আবার রাক্ষসে রাক্ষসে মিলন হইলে, চির কাল দম্পতীকে কলহে কাল যাপন করিতে হয়। এই সকল কুলক্ষণ থাকিলে, সে কন্যাকে কখনও বিবাহ করিবে না; যথা—অধিকাঙ্গী, ধূম্রবর্ণা, রোগিণী, লোমশূন্যা, কিম্বা অধিক লোমযুক্তা, প্রগল্ভা, পিঙ্গলবর্ণা, নক্ষত্র কিম্বা বৃক্ষ নাম্নী ও মধ্যপুষ্টা। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত রাজকন্যাকেও বিবাহ করা শ্রেয়ঃ নহে। শ্যামাঙ্গী, স্থকেশা, স্থলোচনা, স্থমুখী, স্থশীলা, স্থগতি, ও স্থকণ্ঠী কন্যা নীচ কুলোদ্ভবা হইলেও, তাহাকে বিবাহ করিতে শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করেন নাই। পুরুষের পক্ষে বগ্ন, স্থরা-পায়ী, পিঙ্গলবর্ণ, বেশ্যাশক্ত, মূর্খ, গুরুবাক্য অবহেলক অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী, অলস, দীর্ঘসূত্রী ও বংশে কোনও রূপ উৎকট রোগ থাকিলে, সে পাত্রে কদাচ কন্যাদান করিবে না। এই সকল শাস্ত্রোক্ত বিধি কাল প্রভাবে অবিধি হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণ কার লোক প্রয়োজন মতে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কন্যা স্থলক্ষণা কি কুলক্ষণা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার

পূর্ব্বে বরকর্ত্তা অগ্রে লক্ষ্য করেন যে, কন্যাকর্ত্তা নগদে জিনিষে কি আন্দাজ দিতে পারিবেন। মনের মত টাকা এবং গহনা পাইলেই কন্যার আর কোনও দোষই দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

পাঠকগণ, সুবর্ণবণিক্ জাতি চির কালই গর্ব্বিত; এই জন্য, পরসেবায় ও পরান্নে প্রতিপালিত হইতে ভাল বাসেন না। স্বকৃত উপার্জ্জনে স্বাধীন ভাবে কালযাপন করা বণিক্ জাতির স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। কি প্রকারে ধন সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। বণিক্ জাতিরা সৌখীন, অথচ অপব্যয়ী নহেন। সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহে বাস করিতে এবং উত্তম রূপ অশন বসন ব্যবহার করিতে তাঁহাদিগের সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গাধিপ বল্লালসেন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতি কয়েকটিকে কুলমর্য্যাদা দান করিয়া বিষম বিভ্রাটে ফেলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বণিক্ জাতিকে তাহার মধ্যে আনিতে পারেন নাই। বণিক্ জাতির কুল, শীল এবং বংশ মর্য্যাদা স্বতন্ত্র। উৎকৃষ্ট বংশের কন্যা নিকৃষ্ট বংশে সম্প্রদান করিলে, কুল শীলের পক্ষে কোনও হানি হয় না। প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, সে কালের বণিকেরা কন্যাকে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর দিয়া দশ জন কুটুম্ব বান্ধবের সম্মুখে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেন। বণিক্ জাতিরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন; এই জন্য, বণিক্ সমাজের মধ্যে পান দোষ ও পিশাচের ন্যায় মাংসাদি ভোজন প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। এরূপ উৎকৃষ্ট বণিক্ সমাজ স্বখাত সলিলে দিন দিন মগ্ন হইয়া পড়িতেছেন কেন? বিশেষ অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে, বিবাহ বিভ্রাটেই দিন দিন তাঁহাদিগকে হীন-

বীর্য্য ও নীচাশয় করিয়া ফেলিতেছে। বণিক্ জাতি চির কালই ধনলোলুপ, কিন্তু তখনকার বণিকেরা নীচ ভাবাপন্ন ছিলেন না; তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও এক প্রকার উদাসীনের ন্যায় কাল হরণ করিতেন; বিপুল ধন সত্ত্বেও বিলাসী হইতেন না; সদাশয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখিতেন। প্রগাঢ় গুরু ভক্তি থাকায়, কেহ কেহ যথা সর্ব্বস্ব গুরুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া লোকান্তরিত হইতেন। এ সকল কথা কেবল কথার কথা নহে, অদ্যাপি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বণিক্ জাতির গুরু পুরোহিতেরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আজিও ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা শিষ্য ও যজমান দত্ত দান এবং বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন, বণিক্ জাতির বাণিজ্য ও ব্যবসায় লব্ধ ধনে কোন্ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত না হইয়াছে? এবং এক্ষণেও বা কি না হইতেছে? বিদ্যালয়, ঔষধালয়, অতিথিশালা, অনাথনিবাস, অন্নচ্ছত্র, পুষ্করিণী ও কূপ খনন, স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা এবং তীর্থযাত্রিগণের জন্য প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত প্রভৃতি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে বণিক্ জাতিকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সদাচারী ও সৎস্বভাবাপন্ন লোক ছিলেন; সেই মহান্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা একটা সামান্য সামাজিক কুরীতির মূলোচ্ছেদন করিতে পারিতেছি না? না, না, কেবল গতানুশোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, যাহাতে বণিক্‌কুল পুনর্ব্বার পূর্ব্ব ভাব ধারণ করেন, তাহার সাধ্যানুসারে চেষ্টা দেখিতে হইবে। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহা বণিক্ মাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন; নতুবা, কি জন্য এই সুবর্ণ-

বণিক্ হিতসাধিনী সভার সৃষ্টি হইল ? কেনই বা উক্ত সভার প্রথম অধিবেশনের বিজ্ঞাপনী পাঠে সহস্রাধিক সুশিক্ষিত বণিক্ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন ? কেনই বা তাঁহারা অকপট হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ? জ্ঞাতি কুটুম্বের সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়া কোন্ সদাশয় ব্যক্তি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন ? তবে কি সভার উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছে ? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই, অদ্যাপি ফুরাণ চুক্তি করিয়া কন্যার পিতার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে অনেকেই ক্ষান্ত হন নাই।

হে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ! হে বন্ধুগণ! হে কুটুম্ব মহোদয়গণ! আপনারা এক বার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুত্রের বিবাহের টাকায় কে কোথায় বড় মানুষ হইয়াছেন ? কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া সামান্য ধন আদায় করা কি সজ্জনের কার্য্য ? জামাতা পুত্র তুল্য ; সেই জামাতা ও দুহিতাকে বিবাহ কালে কিঞ্চিৎ যৌতুক দিতে কেহই সাধ্যানুসারে ক্রটি করেন না, সে বিষয়ে বলপ্রয়োগ করা কেবল নিষ্ঠুরের কার্য্য মাত্র। ইংরাজি ভাষায় একটি চমৎকার মহাবাক্য আছে ; যথা,—
Do to others as you would that they should do to you.
সংস্কৃত ভাষাতে ইহাপেক্ষাও একটি মহাবাক্য আছে ; যথা—
"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" যদি এই রূপ মহাবাক্য পালনে ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, বিবাহ-ব্যবসায়ী বরকর্ত্তা নিরুপায় কন্যাভারগ্রস্ত পিতার নিকট পূর্ব্বোক্ত রূপে জঘন্য ভাবে অর্থাহরণ করিয়া কিরূপ ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহার আর পরিচয়ের আবশ্যক নাই।

হে সদাশয় বণিক্‌গণ! আমরা পুরুষানুক্রমে পরম পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। আমরা অদ্যাপি সাধ্যানুসারে বৈষ্ণবের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ নবগুণ বিশিষ্ট, সেই রূপ বৈষ্ণবেরাও ষড়্‌গুণ বিশিষ্ট; যথা—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কষ্টসহিষ্ণু, পরোপকারী এবং স্বার্থ-ত্যাগী। আমাদিগের হৃদয়ের ধন অদ্বিতীয় প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু এই কয়েকটি গুণে জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লীলা সম্বরণ করিলে পর, তাঁহার প্রধান পারিষদগণেরও ঐ সকল গুণ ছিল; এই জন্যই তাঁহারা বণিক্ জাতির পরম ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন। হে জাতীয় ভ্রাতৃগণ! চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আমাদিগের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, ও ধমনীতে ধমনীতে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। যিনি মানব জাতির কলুষ নাশের জন্য আপনার প্রাণসমা পত্নী বিষ্ণু-প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নিঃসহায় বৃদ্ধা জননীর প্রতি মুখ তুলিয়া দৃষ্টিপাত করেন নাই, কেবল দেশের উপ-কারের জন্য সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল কামনায় ব্রতী হইয়া ভ্রষ্টমতি দুরাচারগণের প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগের ইষ্টদেব। মহাপ্রভুর সম-কক্ষ নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণ আমাদিগের দীক্ষা গুরু; তবে কেন আমরা সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরপীড়নে রত হই? যখন আমরা বৈষ্ণব বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি, তখন বৈষ্ণবের ষড়্‌গুণ কি বলিয়া পরিত্যাগ করিব?

পাঠকগণ, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক ব্যক্তি

কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া আপনার এক খানি ক্ষুদ্র বসত বাটী বিক্রয় করিলেন। তাহাতেও ভাবী বৈবাহিকের আশা মত ধন সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,—বিবাহ বাসরে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিব। সেই বিবাহের রজনীতে ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। বরকর্ত্তা সমস্ত টাকা না পাইয়া বর উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কন্যাকর্ত্তা সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বরকর্ত্তার চরণে পতিত হইলেন, এবং করজোড়ে গলদশ্রু লোচনে গদ্‌গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন,—মহাশয়, রক্ষা করুন, এ টাকা আমি এক মাসের মধ্যেই যে কোনও প্রকারে পারি, পরিশোধ করিব; এক্ষণে না হয় আমি এক খানি খত লিখিয়া দিতেছি। কন্যাকর্ত্তার এই রূপ অবস্থা দেখিয়াও বরকর্ত্তার হৃদয়ে করুণ রসের আবির্ভাব হইল না। তিনি উন্নত স্বরে কহিলেন,—তুমি প্রতারণা দ্বারা কন্যার বিবাহ দিবার কৌশল করিয়াছ। আমি কখনই শুনিব না; ও রূপ জুয়াচুরি ফন্দী আমি ঢের জানি। এই রূপ কটুকাটব্য বলিয়া পুত্রের হস্ত ধারণ করাতে সভাস্থ কয়েক জন সদাশয় কুটুম্ব একত্র হইয়া বলিলেন,—আসুন মহাশয়, আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া এই নিঃস্ব ব্যক্তির জাতি কুল রক্ষা করি। যদি ঐ তিন জন ব্যক্তির হৃদয়ে দেব ভাবের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে, ঐ কন্যার পিতা কি রূপে যে জাতি রক্ষা করিতেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে।

হা অর্থ! তুমি সংসারের কি অনর্থেরই মূল হইয়াছ! তোমার জন্য লোক না করিতেছে কি? তোমার জন্যই প্রাণপ্রিয় সহোদরে সহোদরে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে; তোমার জন্যই

পিতা অনায়াসে আপন দুহিতাকে অসৎ পাত্রে অর্পণ করিতে বাধ্য হন; তোমার জন্যই রাজপুত্রগণ আপনার পূজ্যপাদ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে; তোমার জন্যই পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে প্রতারণা করিতেছে; তোমার জন্যই দস্যুগণ অম্লান বদনে মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে, তোমার প্রতি যাহাদিগের অসাধারণ স্নেহ মমতা জন্মিয়াছে, দয়া ধর্ম্ম আর তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। হায়! কেহই বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, অর্থ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের কি সুখোৎপত্তি হইতে পারে? অর্থ কোনও কালে শান্তিপ্রদ নহে। অধিক অর্থ সঞ্চয় হইলে, অধিকাংশ লোকেরই প্রায় উন্মাদ দশা উপস্থিত হয়। ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, ধনবান্ লোকেরা কেবল এক ধন গর্ব্বে একেবারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। কোনও কার্য্যে আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করেন না। বোধ করুন, কোনও ব্যক্তির একটি সর্ব্ব সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা আছে। সেই কন্যাটিকে অন্য এক জন ধনবান্ লোকের পুত্র বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। লোক পরম্পরায় তাঁহার মনের ভাব পিতার নিকট গোচর করায়, তিনি নিজ তনয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া হাস্যের সহিত কহিলেন,—কি রে, তোর নাকি অমুকের কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? ছি ছি! অমন কথা মুখে আনিতে নাই! তার ক্ষমতা কি যে, তোকে কন্যা দান করে! তুই যেমন ঘরে জন্মিয়াছিস্, তেমনি ঘরে তোর বিবাহ দিব। সেই বিবাহার্থী যুবা পুরুষ যে ব্যক্তির কন্যার পাণি গ্রহণে অভিলাষ করিয়া-

ছিলেন, তিনি সদ্বংশজাত, সদ্বিদ্বান্ ও সদাশয়; কেবল এক্ষ ধন নাই, এই তাঁহার দোষ। সেই কারণে কন্যাটিকে ধনবান্ লোকের গৃহে বিবাহ দিতে পারিলেন না। বহু কষ্টে যৎসামান্য ব্যয় করিয়া একটা কুরূপ অসচ্চরিত্র নির্ধন পাত্রকে সম্প্রদান করিলেন। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন,—সুলক্ষণা কন্যা যদি নীচকুলোদ্ভব হয়, রাজপুত্রেরাও তাহার পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। তবে সে কন্যাটি মনোমত পতি ধনে বঞ্চিত হইলেন কেন? তাঁহার পিতা অর্থহীন, এই মাত্র কারণ। এক পক্ষে অর্থের অনটন, অপর পক্ষে অর্থের লালসা। যে ব্যক্তি নির্ধনের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিলেন না, কিছু কালের পর, এক জন ধনবানের সেই পাত্রটির প্রতি লক্ষ্য হইল। তাঁহার কন্যাটি কদাকার মাংসপিণ্ড ও কুলক্ষণযুক্ত। সেই কন্যা কেবল পিতার ধনের বলে উক্ত সুপুরুষ যুবার হস্তে অর্পিত হইল। পাত্রের পিতা তাঁহার বধূমাতার রূপের দিকে এক বারও চাহিলেন না। পুত্র বিবাহ করিয়া নগদে জিনিষে সাত হাজার টাকা গৃহে আনিল। সেই আনন্দে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। যাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্ত্তমানে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে কোনও বিষয়ে অনুতাপ করিতে হয় না। কালে কন্দর্পের ন্যায় যুবা পুরুষ আপনার কুরূপা সহধর্ম্মিণীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেন না। অবশেষে, অসৎ সংসর্গের দোষে ঘোর ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেন। তাঁহার নিরপরাধ পত্নীর দিন যামিনী নয়ন নীরে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। কন্যাটির রাশি রাশি স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার আভরণ ছিল, ইন্দ্রালয় তুল্য সুরম্য সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতেন, দেব ভোগ

ভক্ষণ করিতেন, দুই তিন জন কিঙ্করী সর্ব্বদা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। এত দূর বাহ্য সুখ সত্ত্বেও তিনি আপনাকে হত-ভাগা বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। এক পতি সুখই স্ত্রীলোকের প্রার্থনীয়; তাঁহার পিতার বিবেচনার দোষে তিনি জন্মের মত সেই সুখে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

ফুরাণ চুক্তি দ্বারা বিবাহে কিরূপ বিভ্রাট ঘটে, আমাদিগের স্বজাতি মহোদয়গণ তাহা কি এক্ষণেও বুঝিতে পারিতেছেন না? যে ব্যক্তি আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া সপ্ত সহস্র মুদ্রা হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারই ভিতরে ভিতরে পুত্রের পত্নী মনো-নীত না হওয়ায়, কি রূপ অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল, তিনি কি তাহার কারণানুসন্ধান করিয়াছিলেন? অর্থ লোভে কুরূপা কন্যার সহিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় তাঁহাকে কত দূর দুরদৃষ্টের ভাগী হইতে হইল। বাল্যকালে পুত্রটি বিশিষ্ট বিদ্যা-র্জ্জন করিয়াছিলেন, স্বভাবটিও সুন্দর ছিল; কেবল মনোমত পত্নী পাইলেন না বলিয়া মনের খেদে অসৎ সংসর্গে মিলিত হইলেন, এবং তদানুসঙ্গিক সুরাপান প্রভৃতি গর্হিতাচরণে লিপ্ত হইয়া কালে সেই মোহন মূর্ত্তি নানা ঘৃণিত রোগের আবাস ভূমি করিয়া তুলিলেন। এই সকল কথার কি সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইবে? না ইহাই যথেষ্ট বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিবেন?

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভাসদ মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার স্বরচিত কাব্যে লিখিয়াছেন;—

"উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম,
কে কোথা দেখেছ মিলে উত্তমে অধম?"

কেবল এক টাকার বলে, টাকার অভাবে ও শাস্ত্রের প্রতি

লোকের অনাদর হওয়াতে প্রায়ই উত্তমে অধমে মিলন হইতেছে। কালে ইহার ভয়ানক কুফল ফলিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে এই সহরের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটিকে অসৎ পাত্রে দান করিয়াছিলেন বলিয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আপনার প্রভাকর পত্রে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"কারে বলি মন দুখ হায় হায় হায় রে!
সোণার প্রতিমা খানি ফেলিল ডোবায় রে!"

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্ব কথিত দত্ত বাবুদিগের বাটীর বিবাহই কন্যাদানের পক্ষে নজীর হইয়া মধ্য এবং নিম্ন শ্রেণীকে আপন আপন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে বিষম বিপদে ফেলিয়াছে, না ইহার আর কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে? কেবল এক সেই বিবাহ দুইটি এক্ষণকার বিবাহের আদর্শ স্থল হয় নাই; বিবাহ বিভ্রাট সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে, তৎসমুদায় পর্য্যায় ক্রমে বিবৃত করা যাইতেছে ;—

প্রথমতঃ, আমাদিগের সমাজ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে বড় মানুষের মেয়ের বিবাহ আগে আগে অনেক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই সকল বিবাহে সমাজের কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। ধনবান্ লোকেরা অম্লান বদনে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুবিদ্বান্ ধনী সন্তানকে কন্যা দান করিতেন। মধ্যবিধ লোকের উর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে সাহস হইত না, নিম্ন শ্রেণীর ত কথাই নাই। উন্নত শ্রেণীতে উন্নত শ্রেণীতে, মধ্য শ্রেণীতে মধ্য শ্রেণীতে, ও নিম্ন শ্রেণীতে নিম্ন শ্রেণীতে দীর্ঘ কাল ধরিয়া আদান প্রদান চলিয়াছিল। এক এক জন ধনবান্ লোক অন্য

এক ধনবানের গৃহে পর্য্যায় ক্রমে তিন চারিটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি এক এক ঘরে এক এক বংশের বহু কন্যাদান হওয়াতে পিতৃগৃহে যে দুইটি কন্যার পিসী ভাইঝী সম্বন্ধ ছিল, বিবাহের পর, তাহাদিগেরই শাশুড়ী বৌ সম্বন্ধ হইল। খুড়ী ননদ হইয়া পড়িলেন, মাসী মামাশাশুড়ি হইয়া গেলেন, ও জ্যেষ্ঠভাত পত্নীর সহিত বিহান সম্বন্ধ হইল। পুরুষে পুরুষেও হাস্যাস্পদ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রাম শ্যামের এক সম্বন্ধে শ্বশুর, অপর সম্বন্ধে শ্যালক হইলেন, ইহা হইতে কৌতুকাবহ সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে এত দূর আদান প্রদান চলিতে লাগিল যে, বণিক্ সমাজ আর জল পিণ্ডের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেন না। এই রূপ কেবল ধনী স্বর্ণবণিক্‌দিগের গৃহে হইল, এমত নহে, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতেও সেই রূপ বিবাহ হইতে লাগিল। অবশেষে, উন্নত শ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে আর পাত্র পাইলেন না, কাজেই তাঁহাদিগকে মধ্য শ্রেণীতে আসিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইল; সেই সময়ে তাঁহারা একটি ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত হইলেন। প্রথম শ্রেণীর বড়মানুষের কন্যা যখন মধ্য শ্রেণীতে পরিণীতা হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগকে বিবাহের একটু ব্যয় লাঘব করা উচিত ছিল। যখন মধ্য শ্রেণীতে বড়মানুষেরা বিবাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হীরার বালা, মুক্তার মালা, রূপার খাট ও রূপার দান সামগ্রী বন্ধ করিলেই ভাল হইত; কেননা, প্রথম প্রথম বড়মানুষের কন্যাকে বিবাহ করিতে পাইলাম, সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত কুটুম্বিতা হইল, ইহাই মধ্য শ্রেণীরা শ্লাঘা বলিয়া

মানিতেন। ধনীর সহিত ফুরাণ চুক্তি করিতে তাঁহারা অবশ্যই পারিতেন না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রথমেই ধনিগণ আপনাদিগের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তৎকালে তাঁহারা এই রূপ ভাবিয়াছিলেন যে, স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে প্রণালীতে কন্যাগণের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন, সে নিয়ম উঠাইলে, আমাদিগের নিন্দা হইবে। আমাদিগের ঘরে যে বিবাহ করিবে, সেই আমাদিগের বংশ পরম্পরায় যেরূপ দিবার প্রথা আছে, তাহাই পাইবে; ইহার অন্যথা করিতে গেলে, আমাদিগের নিন্দা হইবে। এই রূপ ভাবিয়াই তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর লোকের লোভ বাড়াইয়া দিলেন। আবার মধ্য শ্রেণীরাও যখন নিম্ন শ্রেণীতে নামিলেন, তাঁহারাও ধনীদিগের অনুকরণ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোভ বাড়াইয়া দিলেন। আবার এতচ্ছ্রেণীয় নিম্ন শ্রেণীর বণিকেরাও যখন আপনাদিগের সমকক্ষের মধ্যে পাত্র পাইলেন না, তখন তাঁহারা যে সকল বণিকের সহিত কোনও কালে আদান প্রদান ছিল না, তাঁহাদিগের ঘরে কন্যাদান আরম্ভ করিলেন। এই রূপ আদান প্রদান সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় বংশ মর্য্যাদা রহিল না। পাত্র পাইলেই বিবাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, দোষ গুণের বিচার একেবারে উঠিয়া গেল। বিবাহের সম্বন্ধ কালে পাত্রের রূপ গুণের ও চরিত্র সম্বন্ধের প্রতি আর বিশেষ দৃষ্টি রহিল না। যাঁহার কিঞ্চিৎ ধন আছে, তাঁহারই পুত্র সাধারণের মনোনীত হইলেন। দিন কতক কাল এই রূপ নিয়মে আদান প্রদান চলিল। অবশেষে, অর্থাৎ এক্ষণে যাঁহার দুই তিনটি পুত্র সন্তান আছে, তিনিই কুলীন। ধনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলেও

চলিতেছে না। পাত্রের বাজার একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে তিন চারিটি পুত্রের পিতা করিয়াছেন, তিনি গম্ভীর হইয়া মনে মনে লঙ্কাভাগ করিতেছেন। আবার দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহার কতকগুলি কন্যা হইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই কয়েকটিকে কি করিয়া পার করিবেন, সেই চিন্তাতে আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদিগের সমাজ একরূপে ঘোঁট মঙ্গল হইয়া গেল, হেট মাটী উপর হইয়া পড়িল, ভাল মন্দের বিচার রহিল না, বরপাত্রের গুণের পরিচয় লইবার আবশ্যক রহিল না; কেবল মাত্র 'মেয়ে বড় হইল! পাত্র চাই! পাত্র চাই!' এই রূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে। পাঠক মহাশয়, বোধ করুন, লোক পরম্পরায় সংবাদ আসিল যে, এক্ষণে দুইটি মাত্র ভাল পাত্র আছে, কিন্তু তাঁহাদের কাছে অগ্রসর হয় কে? তাঁহারা উভয়েই ধনুক ভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়া আছেন। দশ জন কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে এক জন নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের অপেক্ষাও সাহসী ছিলেন, তিনি আপন পুরোহিতকে বলিলেন,—আপনি যাইয়া এক বার দরটাই জানুন না, বরকর্ত্তা ত আর বাঘ ভাল্লুক নহেন যে, খাইয়া ফেলিবেন। পুরোহিত কহিলেন,—মহাশয়, আপনি জানেন না, বাঘ ভাল্লুকের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের উপায় আছে, কিন্তু এক্ষণকার বরের বাপের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের উপায় নাই। ব্যাঘ্র ভল্লুকে বনে বনে বেড়াইয়া বড় কষ্টে একটি হীনবল পশু শীকার করিয়া উদরস্থ করে, কিন্তু এ কালের বরের বাপ 'ভাস্বরকো নাম' সিংহের ন্যায় আপনার আবাস স্থানে উপবিষ্ট থাকেন, নির্জীব শশকরূপী কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিবৃন্দ

যেন কড়ার মত ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার তীক্ষ্ণ 'দংষ্ট্রান্তর্গত' হন। সে যাহা হউক, আপনি আদেশ করিতেছেন, আমি আপনার হিতকারী, অবশ্যই বরপাত্রের পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহার আভাষ লইয়া আসিব। পুরোহিত শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে বরকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার যজমানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণ মাত্রেই বরকর্ত্তা একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন,—কার মেয়ে? অমুকের! তিনি কি আমার ফুরাণ চুক্তির ভিতরে আসিতে পারিবেন? আমি সর্ব্ব সমেত পাঁচ হাজার টাকার এক কড়া কড়ির কমেও পুত্রের বিবাহ দিব না। তোমার বাবুকে গিয়া সংবাদ দাও, তিনি যদি এই চুক্তিতে রাজী হন, তাহা হইলে, আমিও তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে রাজী আছি। পুরোহিত কহিলেন,—মহাশয়, এ যে অন্যায় কথা; যা রয় বসে সেই রূপ একটা কথা বলিলে ভাল হয়। একটি মেয়ে হইলেও বা বলিয়া কহিয়া উহাতে রাজী করিতাম, কিন্তু তাঁহার তিন তিনটি মেয়ে। প্রথমটিকে যাহা দিবেন, অপর দুইটিকেও সেই রূপ দিতে হইবে। বাবু আমাদের গৃহস্থ মানুষ, তাঁহাকে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তাহার বড় মেয়েটিকে আর তিনি রাখিতে পারিতেছেন না; অতএব মহাশয়কে এ বিষয়ে একটু কৃপা করিতেই হইবে। এই কথা শুনিবা মাত্র বরের বাপ রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন,—ঠাকুর, তুমি ত বেশ কথা বোল্‌লে! আমি ব্যাটার বিয়ে দিতে বসেচি, না পুণ্য কত্তে বসেচি? যেখানে আমি দশ টাকা জেয়াদা পাব, সেই খানেই আমার ছেলের বিয়ে দেব। তিনি কমে পান, অন্য জায়গায় বিয়ে দেবেন। যান ঠাকুর,

প্রণাম করি, আর মিছে বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া বরকর্ত্তা 'গাড্ডু টেঙ্গার' মত ফুলিতে ফুলিতে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। পুরোহিত বিরস বদনে আপনার যজমানের বাটীতে আসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কন্যাকর্ত্তা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, ও নিম্ন লিখিত মতে মনে মনে আক্ষেপ আরম্ভ করিলেন ;—

কি ভয়ানক কাল উপস্থিত হইল ! আমি কি করিয়া তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়া জাতি কুল রক্ষা করিব ? পনর হাজার টাকা কোথায় পাইব ? যদি এক একটি কন্যার বিবাহে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে, আমার খুঁটিয়া খাইবার কিছুই থাকিবে না। আমার যাহা ঘটিয়াছে, ইহাকেই লোকে উভয় সঙ্কট কহিয়া থাকে। এক দিকে দীনতা, অপর দিকে জাতিনাশ। বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কন্যাভার-গ্রস্ত বলিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারিব না ; তবে কি করিয়া এ দায় হইতে মুক্ত হইব ? বড় মেয়েটিকে যে আর ছয় মাস কালও অনূঢ়া অবস্থায় রাখিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আমার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি স্থির করিতে পারিব না। এক বার আমাদিগের হিতসাধিনী সভার সভ্যগণের নিকট যাইয়া আমার মনের আক্ষেপ জানাই ; তাঁহারা যে রূপ পরামর্শ দিবেন, সেই রূপ করিব ; যদি যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তিনটি কন্যার বিবাহ দিতে বলেন, অগত্যা আমাকে তাহাই করিতে হইবে। মেয়ে কটার গতি মুক্তি করিয়া পতি পত্নীতে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিব। এই রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া উক্ত সভার কোনও সভ্যের নিকটে গিয়া

গোপনে এই বিপদের কথা জ্ঞাত করায়, তিনি সাধ্যানু-সারে বরকর্ত্তাকে বুঝাইতে গেলেন ; কিন্তু বরকর্ত্তা এক কথায় সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন ;—অর্থাৎ, এক্ষণে আমার পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই। এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ভাল নহে। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, বিবাহ দিব না। এ কথার উপর আর হিতসাধিনী সভার সভ্য কি কথা কহিবেন? কাজেই তাঁহাকে নিঃশব্দে বাটী ফিরিয়া আসিতে হইল। হিতসাধিনী সভার সভ্যকে সঙ্গোপনে পুরাণ চুক্তির কথা জানাইয়া পূর্ব্বোক্ত কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তি আর এক নূতন বিপদে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সহিত আর কেহই সম্বন্ধের কথা কহিতে চাহেন না। অবশেষে, বসত বাটী খানি বন্ধক দিয়া পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন, এবং দন্তে তৃণ করিয়া শত সহস্র ঘাট মানিয়া সেই পাত্রের সহিত আপনার কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইলেন।

পাঠকগণ, তবে কি আমাদিগের হিতসাধিনী সভার মহদুদ্দেশ্য সাধন হইবে না? তাঁহারা যে কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তি-বৃন্দের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কয়েক বৎসর কাল ঐ কুরীতি উঠাইবার জন্য কায়মনে যত্ন করিলেন ; তৎসমুদায় কি নিষ্ফল হইল? না, তাহা কখনই হইবে না। এই পৃথিবীর খণ্ড চতুষ্টয়ে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কত শত বার সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিপ্লব জন সাধারণের অসহ্য বোধ হইলেই করুণাময় ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষ দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদন করিয়া

থাকেন। এক সময় ইউরোপ খণ্ডে ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যের একশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। পোপের অনুচরেরা নানা কৌশলে ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদিগের অর্থ শোষণ করিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান ভূপালগণকে ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইয়া লইতেন। যখন পোপের দারুণ দৌরাত্ম্য সদাশয় সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য বোধ হইল, তখন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মার্‌টিন্ লূথর জনসাধারণের পক্ষ হইয়া ধর্ম্ম পুস্তকের যথার্থ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; এবং বহুকাল ধরিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া ক্যাথলিক্ দলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিলেন। তিনি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পোপের অনুচরেরা অনেক বার তাঁহার জীবনান্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় জন সাধারণকে যেরূপ ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, লূথর দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে একাকী সেই ভ্রম সংশোধন করিতে অগ্রসর হন; পোপের ভয়ে সে সময় কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে সাহস করেন নাই। অবশেষে, কেবল এক লূথরের অধ্যবসায়ের গুণে প্রটেষ্টান্ট্ মতের সৃষ্টি হইল। পোপের অত্যাচার হইতে ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে প্রটেষ্টান্ট্ সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

আমাদিগের দেশে এক সময়ে কাপালিক ও বামাচারী সম্প্রদায়ের মত বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কথা এক্ষণে পুনরুক্তি করিতে গেলেও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কালিকা দেবীর বরপুত্র বামাচারিগণ রক্তবস্ত্র, রক্তজবার মালা, এবং ললাটে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র

পরিত। স্ত্রীলোকের আদ্য ঋতুর শোণিত রক্তজবায় মাখিয়া মহামায়ার পূজা করিত, মদ্য মাংস ব্যতিরেকে তাহাদিগের আহার হইত না, ব্যভিচারকেই কৈবল্য লাভের এক মাত্র সোপান বলিত, অজস্র ছাগ, মহিষ, মেষ বলিদান করিয়াও তাহাদিগের তৃপ্তি লাভ হইত না; অবশেষে, নরবলি দিয়া ইষ্টদেবীর পূজা করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। সময়ে সময়ে সেই নৃশংস পিশাচেরা হীনবল লোকের সন্তানগণকে চুরি করিয়া বলি- দান দিত। চণ্ডাল বালককে পাইলে, বলে ছলে কৌশলে তাহার জীবনান্ত করিত, এবং সেই শব শ্মশান ভূমিতে কিম্বা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে লইয়া গিয়া শবসাধন করিত। শুষ্ক তর্কে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, ধর্ম্ম দূরে পলায়ন করিত। জীবহনন, সুরাপান, পরদার ইহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া তাহদিগের নিকট পরিগণিত হইত। যখন বঙ্গ দেশ বামাচারী সম্প্রদায়ের অত্যাচার রূপ তমসায় সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, সেই সময় পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া প্রেমের বলে অসংখ্য বামাচারীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তিনিই পিশাচগণের মনে পুনরায় করুণ রসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দুরাত্মা- গণকে হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, এবং মধুর হরিনামে বঙ্গ দেশ মাতাইয়া ক্ষুদ্র ভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ও চণ্ডাল ব্রাহ্মণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বলিয়া বেড়াইতেন,—ভাই, আমরা সকলে ভাই ভাই; আমাদিগের মধ্যে ছোট বড় নাই, আমাদিগের ভিতর আত্মপর নাই। আইস,

আমরা সকলে এক মনে এক ধ্যানে এবং এক প্রাণে পিতা হরির প্রেমে মত্ত হই; একের দুঃখে সকলেই দুঃখিত হই, ও একের আহ্লাদে সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করি। কেহ কাহাকে পর ভাবিও না, সকলের কাছে হৃদয় খুলিয়া দাও, তাহা হইলেই পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন হইবে। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা বিষে আর তোমাদিগকে জর্জ্জরীভূত করিতে পারিবে না।

পাঠকগণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও আবার বলিতেছি, আমরা সেই অদ্বিতীয় প্রেমময় পরম দয়াময় স্বার্থত্যাগী চৈতন্য-দেবের শিষ্য; বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের বশীভূত নই। তাঁহার প্রিয়সখা নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আপনার পারিষদ এবং বংশধরগণকে যেরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, আমরা পুরুষানুক্রমে গোস্বামিগণের কৃপায় সেই পবিত্র ধর্ম্মে মতি করিয়া আসিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন একাকী সেই কদাচারী বামাচারিগণকে সদাচারী করিতে পারিয়াছিলেন, এবং হিন্দু জাতির মধ্যে ভয়ানক বৈষম্য দোষ দূর করিয়া সকলকে সাম্যনীতির সারতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন, তখন আমরা সেই মহাপ্রভুর শিষ্য. আমাদিগের কখনই স্বজাতির কষ্ট দেখা উচিত নহে। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহা আমা-দিগের সমাজের দশ জন লোক ও অন্তরেরর সহিত বুঝিয়া থাকিবেন। যদি পাঁচ জনেরও পর দুঃখে মনঃপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া থাকে, যদি ন্যূন কল্পে দুই জনেরও পরোপকার ব্রতে দৃঢ় সংকল্প হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তবে এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে

যে, এক দিনে রোম রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই, এক দিনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গ ভূমিকে হরিনামে মাতাইতে ও সাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। স্বজাতির ও স্বদেশের মহৎ কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী হইলে, প্রথম প্রথম অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, অনেক আপদ বিপদ্ ভোগ করিতে হয়, এবং অজ্ঞ জন সমীপে কখনও কখনও অপমানিত হইতে হয়, সে সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতে গেলে হইবে না। যাহা করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার সম্মুখে শত সহস্র বাধা উপস্থিত হইলেও আমাদিগের ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া উচিত নহে; কারণ, এক ধৈর্য্যই সংসারের সমস্ত হিতকর কার্য্যের প্রধান উত্তর সাধক। এক্ষণে আমাদিগের ধৈর্য্যের সহিত এই করা কর্ত্তব্য হইয়াছে যে, তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইয়া, উন্নত ভূধর অপেক্ষাও ধৈর্য্য ধরিয়া এবং সমূহ অপমানকে সম্মান জ্ঞান করিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে কন্যার বিবাহ বিপ্লবের বিষয় বুঝাইয়া দিব; এবং করজোড়ে পুনঃ পুনঃ বলিব,—হে বণিক্ মহোদয়গণ! আমাদিগের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কুটুম্ব বান্ধবেরা অধিকাংশ চাকুরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কন্যার বিবাহে উচ্চ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কষ্ট বোধ হইতেছে। আসুন, আমরা স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সেই ভার লাঘব করিয়া দি; ইহাতে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা দুইই আছে। স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার এই এক উপযুক্ত সময়। যখন জাতীয় ভ্রাতৃগণ গলদশ্রু লোচনে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে সেই সাহায্য দান করা উচিত কি না? কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে সাহায্য চাহিতেছেন, দশ জনে ঐক্য

হইলে, তাহা আমরা অনায়াসে দিতে পারি। তাহাতে অর্থের প্রয়োজন নাই, সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই ; কেবল যাঁহারা বরকর্ত্তা, তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে। এক ফুরাণ চুক্তির প্রথা প্রচলিত হওয়াতে, বণিক্ সমাজে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে ; সেই জন্য, অনেকে সৎপাত্রে কন্যা দান করিতে পারিতেছেন না, ভাল মন্দের বিচার থাকিতেছে না, পতি পত্নীর মনোমত মিলন হইতেছে না। ধনহীনের স্বরূপা কন্যা কেবল এক অর্থের অনটন বশতঃ অসৎপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে। বিবাহ কালে পাত্রের কোনও দোষ গুণের পরিচয় লওয়া হয় না, কেবল এক ধন থাকিলেই সমস্ত দোষ ঢাকিয়া যায়। ধনের দিকে এক মাত্র লক্ষ্য থাকায়, অনেকে উন্মাদগ্রস্তকেও অম্লান বদনে কন্যা দান করিতেছেন। পক্ষান্তরে, কেবল ধনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নীরোগ বলিষ্ঠ ও পরম সুন্দর যুবা পুরুষেরা নানা প্রকার সংক্রামক রোগগ্রস্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিতেছেন। বিবাহ কালে এক দিকে ফুরাণ চুক্তি, অপর দিকে ধনের লোভ, এই দুই বিষয় একত্র হওয়ায়, কত প্রকার এক কুল ক্রমাগত রোগ অন্য কুলে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিতেছে ; তজ্জন্য, অকাল মৃত্যুর আধিক্য হওয়ায়, অনেক বণিক্ কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আমরণ কাল দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমাদিগের সমাজ সঙ্কীর্ণ হওয়াতে এক পরিবারের সহিত পুনঃ পুনঃ আদান প্রদান চলিতেছে। এই প্রথা যে কত দূর অনিষ্ট-কারী, নিম্নে তাহার একটি সামান্য উদাহরণ প্রদত্ত হইল ;—

এক খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, কোনও সময়

পর্টুগালের রাজপরিবার দীর্ঘ কাল ধরিয়া মাতামহকুলের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন। কালে সেই রাজপরিবারের মধ্যে জড়, মূক, হীনবীর্য্য ও খর্ব্বাকার সন্তান সন্ততির জন্ম হইতে লাগিল। যখন রাজপরিবারেরা হীনবীর্য্য সন্তান সন্ততি জন্মিবার কারণ জানিতে পারিলেন, তখন ভিন্ন জাতীয় রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পুনর্ব্বার রাজবংশে পরম সুন্দর বীর্য্যবান্ সন্তান জন্মিতে লাগিল। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এক খণ্ড উর্ব্বরা ভূমিতে ক্রমাগত এক প্রকার শস্য বপন করিলে, সেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, তখন এক পরিবারের সহিত পুনঃ পুনঃ আদান প্রদান চালাইলে, হীনবীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হইবে না কেন? পাঠকগণ, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ কি প্রকার দীর্ঘাকার ও সবল শরীর ছিলেন, কি রূপ আহার করিতে পারিতেন, ও কি রূপ শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন; আমরা কি তাঁহাদিগের সেই সকল গুণের দশাংশের একাংশেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি? আপনারা চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন যে, বণিক্ জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে হীনবীর্য্য ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িয়াছেন কি না?

কন্যা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে আমরা আর একটি বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছি। আমরা এক্ষণে বরের সহিত বিবাহ না দিয়া বরের বিষয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া থাকি। একটা কথায় বলিয়া থাকে,—'রাজায় পড়িলেও রাণী হয় না, পাতে পড়িলেও খাইতে পায় না।' কিছু কাল পূর্ব্বে অনেক ধনাঢ্য বণিক্ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাজা রাজ্ড়া ও কোটিপতির সহিত

আপন আপন দুহিতৃগণের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সকল বণিক্ কন্যারা প্রায় কেহই পতি লইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। কাল প্রভাবে ধনী সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রায়ই কুপথগামী হন। স্বামী ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে, অমরাবতীর সুখ সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের মনঃপীড়ার অবধি থাকে না। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অস্মজ্জাতীয় রমণীগণ কোটিপতির পত্নী হইয়াও নিদারুণ মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। আরও দেখা যায় যে, যাঁহারা নিঃস্ব লোকের সন্তানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন শুভাদৃষ্টের ফলে সেই সকল কামিনীকুল এক্ষণে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কন্যার ভাবী সুখের জন্য পাত্রের দোষ গুণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাঁহারা কেবল এক ধন দেখিয়া বিবাহ দেন, তাঁহাদিগের কন্যারা প্রায়ই সুখী হন না, ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি আপন আপন দুহিতৃগণকে চিরসুখিনী করিতে চাহেন, বিবাহ বিভ্রাট অর্থাৎ ফুরাণ চুক্তি সম্বন্ধে কন্যার বিবাহে যে রূপ সমূহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যদি দূর করিতে চাহেন, তাহা হইলে, আমাদিগের সঙ্কীর্ণ সমাজ বিস্তীর্ণ করিবার চেষ্টা দেখুন। নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্ মহাশয়েরা দাক্ষিণাত্য বণিক্গণের গৃহে কন্যা দান করিয়াছেন; কিন্তু সে পক্ষেও ধনের দিকে লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই। না করুন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে না। যদি পাঁচ ছয় শত ঘর দাক্ষিণাত্য বণিকের

সহিত আমাদিগের আদান প্রদান চলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ বরের বাজার শস্তা হইয়া আসিবে।

দাক্ষিণাত্য বণিক্ ভিন্ন আরও দুইটি বণিক্ সম্প্রদায় আছেন। তাঁহাদিগের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ করিলে, আমাদিগের ধর্ম্মের হানি হইবে না, অথচ পাত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ভয় অনেক অংশে তিরোহিত হইয়া যাইবে। আমি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি যে, হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুল্‌টি কৃষ্ণদেবপুরে, অম্বিকা কাল্‌না ও সাতগাছিয়া প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্য ধনাঢ্য বণিক্ বাস করেন। আমরা যদি কেবল একটু প্রচলিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কুটুম্বিতা আরম্ভ করি, তাহা হইলে, আর ফুরাণ চুক্তির এত দূর আধিক্য থাকিবে না। যে সকল বণিক্-দিগের সহিত আমাদিগের অদ্যাপি আদান প্রদান চলে নাই, তাঁহারা কলিকাতার বণিক্‌গণের সহিত পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক কুটুম্বিতা করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এক্ষণে আমরা ন্যূনাধিক সহস্র ঘর বণিক্ এক দলভুক্ত হইয়া আছি। আমাদিগের সহিত পাঁচ ছয় শত ঘর দাক্ষিণাত্য ও অপর দুই শ্রেণীর সাত আট শত ঘর একত্র সংযুক্ত হইলে, আমাদিগের সঙ্কীর্ণ সমাজ বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে। এ রূপ হইলে, বরকর্ত্তা আর কন্যাকর্ত্তাকে তত দূর পীড়ন করিতে পারিবেন না। যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য, তাহারই মূল্য অধিক। এক সময়ে এক টাকা সের পটল ক্রয় করিতে হয়, সেই পটলই অধিক পরিমাণে জন্মিলে, তাহার দুই পয়সা সের হইয়া উঠে। বাজারে যখন দুইটি কি তিনটি মাত্র পাত্র আছে, কিন্তু পঁচিশ জন লোক কন্যা বয়স্থা হইল বলিয়া

পাত্রান্বেষণ করিতেছেন, এমত অবস্থায় বরকর্ত্তারা কন্যাকর্ত্তাকে পীড়ন করিতে পারেন। কিন্তু মনে করুন, এক ব্যক্তির কন্যা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, বিবাহ না দিয়া আর রাখিতে পারেন না। প্রথমতঃ, কলিকাতায় পাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, এখানকার পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া তাঁহার শক্তির অতীত কার্য্য। তথায় অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে, দুই সহস্র মুদ্রার কমে কোনও ক্রমেই তাঁহার কন্যার বিবাহ হয় না; সুতরাং, তাঁহাকে পাণ্ডুয়া গ্রামে গিয়া পাত্রানুসন্ধান করিতে হইল। সেখানে একটি মধ্যবিধ গৃহস্থের পুত্রের সহিত আপন দুহিতার শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলেন; এক হাজার টাকার মধ্যেই সে সম্বন্ধ কার্য্যে পরিণত হইয়া গেল। তাঁহার দেখা দেখি আরও দুই পাঁচ জন মধ্যবিধ লোক কেহ বা কুল্‌টিতে, কেহ বা অম্বিকা কাল্‌নায় এবং কেহ কেহ বা সাতগাছিয়া বা গুপ্তীপাড়ায় আপন আপন দুহিতার বিবাহ দিলেন। সেই সকল বিবাহে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বরপাত্র পাওয়া গেল, অথচ অল্প ব্যয়ে কার্য্য শেষ হইল। এই রূপ সুবিধা দেখিয়া অনেকেই ইতস্ততঃ আপনার কন্যাগুলির বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন।

আমাদিগের সপ্তগ্রামীয় বণিক্‌ মহাশয়গণ, যাঁহারা সভা সমক্ষে কোনও আপত্তি উপস্থিত না করিয়া চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই জঘন্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা চারি সম্প্রদায়ের বণিক্‌কে একত্র করিয়া লইবার প্রস্তাব করিতেছি; কেননা, বিস্তীর্ণ সমাজ হইলে, বর পাত্রের বাজার ক্রমে ক্রমে সুলভ হইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগের সপ্ত-

গ্রামীয় বণিক্ মহাশয়েরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দূষিত না হইয়া যদি সরল ভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে, সকল আপদ্ই মিটিয়া যায়।

এই বঙ্গ দেশের মধ্যে যে কয়েক সম্প্রদায় বণিক্ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে (অন্য সম্প্রদায় বণিকেরা স্বীকার করুন বা করুন) ধনে মানে কুলে শীলে সপ্তগ্রামীয়েরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার বণিক্গণকে দূর দেশস্থ বণিকেরা বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন; কেবল জন কতক স্বার্থপর লোকের জন্য আমরা সেই সঞ্চিত সম্মানের হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইতেছি। চারি সমাজের বণিক্ একত্র করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর কন্যাভারগ্রস্ত লোক কন্যাদান করিবার পাত্র পান না; যদিও সপ্তগ্রামীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পান, কিন্তু ফুরাণ চুক্তিতে তাঁহাদিগের ঘরে কন্যাদান করিবার ক্ষমতা হয় না। সহরের কয়েক ঘর সপ্তগ্রামীয় স্মবর্ণবণিক্, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন, সমানে সমানে আদান প্রদান কালে 'দেওয়া থোওয়া' সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনও কথাই উপস্থিত হয় না। ধনী লোকেরা যখন নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ মধ্য শ্রেণীতে কন্যা দান করেন, সে সময়েও ফুরাণ চুক্তির কথা উত্থাপিত হয় না। কিন্তু যদি এক জন গৃহস্থ লোক পাত্রের নিতান্ত অভাব বশতঃ ধনীলোকের গৃহে আসিয়া কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, সেই সময় ফুরাণ চুক্তির কথা উপস্থিত হয়। যখন সেই চুক্তির কথা গৃহস্থলোকের ঘরে সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই সময় গৃহস্থ লোকেরাই কন্যাদানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কষ্ট পাইয়া ফুরাণ চুক্তি রূপ জঘন্য প্রথা

উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন; এবং সহরের ও মফঃস্বলের সপ্তগ্রামীয় সমস্ত বণিক একত্র হইয়া তাঁহাদিগের সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সেই জন্যই প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং ফুরাণ চুক্তি রূপ পাড়ক প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। অবশেষে, সকলে এক মত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দশ জন একত্র হইয়া যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, এক্ষণে আবার কেহ কেহ সে বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? যদি তাঁহাদিগের মনে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ শোষণ করিবই করিব, তাহা হইলে, সেই বিরাট সভায় তাঁহাদিগের না আসাই যুক্তি যুক্ত ছিল। যদিও অনুরোধ বা অন্য কোনও কারণে সভাস্থলে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সদর্পে এবং চক্ষুঃলজ্জা একেবারে পরিহার পূর্ব্বক মুক্ত কণ্ঠে বলা উচিত ছিল যে, আমরা ফুরাণ চুক্তি উঠাইতে পারিব না। এ সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে; নিজের অপকার করিয়া পরোপকারের জন্য আমরা স্বার্থ ত্যাগ করিব কেন? সরল ভাবে এ রূপ কথা কহিলে, আর এ জঞ্জাল ঘটিত না। কিন্তু সভা সমক্ষে যাঁহারা আপনাদিগের সৌজন্য জানাইয়া কার্য্য কালে তাহার অন্যথা করিতেছেন, স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের উপর সদাশয় ব্যক্তিবৃন্দের মনে মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে কি না?

আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালির সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্য কালে অনে-

কেই দশ হাত অন্তরে অবস্থিতি করেন। যে কোনও কার্য্যের প্রস্তাবনায় আমাদিগের জ্বলন্ত উৎসাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তৎসাধন কালে সেই উৎসাহ ধূমবৎ উড়িয়া যায়। "One with a flash begins and ends in smoke." ইংরাজ কবির এই বাক্যটি বাঙ্গালির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। কে না জানেন, দুই বার ব্যাঙ্ক সংস্থাপন, মাননীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ প্রচলন, প্রথম মেট্রোপলিটেন কলেজ সংস্থাপন, সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা সংস্থাপন প্রভৃতি বাঙ্গালির প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই উপরি উক্ত কবির কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্ হিত-সাধিনী সভার ভাগ্যেও সেই রূপ না হয়, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা প্রায় সকল বিষয়েই ইংরাজ জাতির অনুকরণ করি; কিন্তু তাঁহাদিগের সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের অনুকরণ করিতে অদ্যাপি শিখিলাম না। ইংরাজ বীর পুরুষের কথা দূরে থাকুক, বিগত সিপাহি যুদ্ধের সময় ইংরাজ মহিলারা এক হইয়া এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য আমরা যথা সর্ব্বস্ব পণ করিব। যদি অর্থের অনটন ঘটে, তাহা হইলে, আমাদিগের মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া উচ্চ মূল্যে পারিসের বাজারে বিক্রয় করিব, এবং সেই টাকায় সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সাহায্য করিব। ইংরাজ জাতির অধ্যবসায়ের দুই চারিটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে গ্রহণ করিতে গেলে, প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়িবে; এই জন্য, একটি মাত্র কথা বলিয়া ইংরাজ জাতির অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি; পাঠকগণ, বোধ হয়, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি-

বেন। বিগত ইলবার্ট্ বিল্ বিধি বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজ জর নারীরা একত্র সমবেত হইয়া তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া Angle-Indian Defence Association সংস্থাপন করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ইলবার্ট্ বিল্ লইয়া ইংরাজ জাতি না করিয়াছিলেন কি ? কেবল তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ের গুণে (?) ইলবার্ট্ বিল্ বিধিবদ্ধ হওয়া না হওয়া সমান হইয়া পড়িয়াছে। আর আমাদিগের সমাজের লোক পুত্রের বিবাহ দিয়া সামান্য অর্থ সংগ্রহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না ! যখন ইংরাজ জাতি জঘন্য দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, তখন এক এক জন দাস ব্যবসায়ীকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেবল এক স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধনের জন্য শত শত ইংরাজ দাস ব্যবসায়ী অকপট হৃদয়ে আপনাদিগের অধীনস্থ দাস দাসীগণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজ জাতির এই সকল মহৎ কার্য্য দেখিয়াও আমরা সামান্য অর্থের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না ? কি পরিতাপ ! কি লজ্জা ! অন্য জাতিরা যদি পরিহাস করিয়া বলে,— সুবর্ণবণিকেরা ফুরাণ চুক্তি উঠাইবার জন্য এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সে সভার উদ্দেশ্য সাধন হইল না। এ কথা শুনিলে কি আমাদিগের মর্ম্মে ব্যথা লাগিবে না ? লোকে যে জাতিকে লক্ষ্মীর বরপুত্র বলিয়া থাকে, সামান্য অর্থের নিমিত্ত সেই সুবর্ণবণিক্ জাতি চির কালের জন্য কলঙ্ক পতাকা উড্ডীয়মান রাখিবেন ? এ কথা ভাবিতে গেলেও আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়।

হে জাতীয় ভ্রাতৃগণ! আমরা আপনারা বিবেচনা করিয়া যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছি, যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, সে কার্য্য অবশ্য সমাধা করিব; সামান্য অর্থের দিকে কখনই দৃষ্টি রাখিব না। আমাদিগের সমাজ হইতে যখন ফুরাণ চুক্তি একেবারে উঠিয়া যাইবে, তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য হিন্দু জাতিরাও আমাদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া আপন আপন জাতির মঙ্গল সাধন করিবেন। বিবাহ সম্বন্ধে কেবল আমাদিগের বিভ্রাট ঘটিয়াছে এমত নহে, বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই ফুরাণ চুক্তি রূপ পীড়ক প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বণিক্ জাতির বিবাহের আড়ম্বর দেখিয়াই অন্য অন্য জাতিরা তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ভাল, তাহাই সত্য বলিয়া ধরিলাম। আমাদিগের দেখিয়া যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, আসুন, আবার আমরাই তাহার নিবৃত্তির পথদর্শক হই; ইহা অপেক্ষা বণিক্ জাতির শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে? পাঠকগণের অবিদিত নাই, এ কালকার অপেক্ষা সে কালের বণিক্ জাতির অধিক ধন ছিল। কি প্রণালীতে ধনার্জ্জন এবং ধন সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা তাঁহারাই জানিতেন। অর্জ্জন ব্যতিরেকে আর তাঁহাদিগের কোনও দিকেই দৃষ্টি ছিল না; এই জন্য, তৎকালে বণিক্‌দিগের মধ্যে প্রায় কেহই উচ্চশিক্ষার অধিকারী হন নাই। সে কালে তাঁহারা যে প্রণালীতে কাল কাটাইয়াছিলেন, সে এক স্বতন্ত্র কাল; তৎকালের রীতি নীতি ব্যবহার আহার পরিচ্ছদ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। বিলাস কাহাকে বলে, তাহা বণিকেরা জানিতেন না; সকলেই স্ব

স্ব প্রধান ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়া বঙ্গাধিপ বল্লাল সেন বণিক্ জাতিকে হীন জাতির মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। যদিও শাস্ত্রানুসারে বণি-কেরা বৈশ্য জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন, কেবল এক উগ্র স্বভাব ও স্বার্থপরতা দোষে বঙ্গাধিপ তাঁহাদিগকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়া গিয়াছেন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বণিক্ জাতি বঙ্গের অন্যান্য জাতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখিতেন না। রাজা ও রাজপুরুষদিগের সহিত দীর্ঘ কাল তাঁহা-দিগের কোনও সংস্রব ছিল না। এই সকল কারণে বণিকেরা সাধারণ হিন্দু সমাজে বিশেষ জাতীয় সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। এক্ষণে আর সে কাল নাই, সে বল্লাল সেনও নাই, সে সমাজের বন্ধনও নাই। আজ কাল বণিকেরা অনেকে রাজদ্বারে নানা রূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন, বঙ্গের ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য হইতেছেন, সিবিল্ শেসন্ জজ, সুবার্ডিনেট্ জজ, মুন্সেফ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্, বারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষা সমাজের পরিদর্শক, শিক্ষক ও গ্রন্থকার প্রভৃতি সকল অধিকারেই আপনা-দিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত বণিক্দিগের বিলক্ষণ মিশামিশি হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় অন্যান্য জাতির প্রতি বণিক্দিগের আর বিদ্বেষ ভাব দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছেন ; এক কথায় বলিতে গেলে, আজ কাল বণিক্ সমাজের প্রায় সর্ব্ববিধায় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। এ সময়ে বণিক্ জাতিকে একটা গুরুতর দোষ মস্তকে বহন করিতে দেখিলে, যার পর নাই পরিতাপিত হইতে হয়।

আজ কাল বণিক্ সমাজের অধিকাংশ লোকে সর্ব্বতোভাবে সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, কাহারও কাহারও তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন হইয়াছে। তবে অধিক সংখ্যক লোকের শৈথিল্য বশতঃ তাঁহারা এখনও সর্ব্বতোভাবে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারিতেছেন না। যে জাতি স্বজাতির মঙ্গল বিধানে যত্নশীল নহেন, কোনও কালেই তাঁহাদিগের উন্নতি হয় না। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সামান্য অর্থের লোভ দূরে থাকুক, জাতীয় উন্নতি ও গৌরব বর্দ্ধনের জন্য এক এক জন মহামনা ইংরাজ আত্ম বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। অতএব হে বণিক্ মহোদয়গণ! আর আপনারা মোহ নিদ্রায় অবিভূত থাকিবেন না, গাত্রোত্থান করুন; স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সামান্য অর্থের কথা কি, আপনার শরীরকে উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করুন। মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে? আত্মত্যাগ স্বীকার ও পরোপকারে যত্ন, এই দুইটি কার্য্যের দ্বারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ হয়, তাহা না হইলে, সংসারে অনেক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং কালে বা অকালে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কে কাহার নাম স্মরণ করিয়া রাখে? কেবল কীর্ত্তিমান্ লোকেরাই চির কালের জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

আমাদিগের এই হিতসাধিনী সভাটি বণিক্ জাতির একটি কীর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করুন; এ কীর্ত্তি যাহাতে লোপ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হউন। আমি বিনীত ভাবে গলবস্ত্রে ও যুগ্ম করে আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে নিঃস্ব বণিক্‌গণ, যাঁহারা কন্যাভারে নিতান্ত ভারাক্রান্ত হন, তাঁহাদিগের প্রতি আপনারা সহানুভূতি প্রকাশ করুন। সংসারের মধ্যে

প্রেম এক অমূল্য নিধি, আমাদিগের চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল এক প্রেমেই জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা স্বজাতির প্রতি সেই রূপ প্রেম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে, আমরা হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিব, আমাদিগের সর্ব্ববিধ সংস্কার সুসম্পন্ন হইবে।

সম্পূর্ণ

পূর্ব্বভাষ।

আজ কাল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কোন্ সামাজিক প্রস্তাব গুরুত্বানুসারে প্রধান রূপে আলোচিত হওয়া উচিত, ইহা বিশিষ্ট রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাহা 'বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী।' এ দেশের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির মধ্যেই বিবাহ-ব্যাপার অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। যে হিন্দু জাতির বিবাহ অন্যান্য জাতি সমূহের বিবাহের ন্যায় কেবল চুক্তি বিশেষ নহে, যাঁহাদিগের বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ইহ-লোকের সীমা অতিক্রম করিয়া লোকান্তর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, যাঁহাদিগের বিবাহ জীবনের একটি প্রধান সংস্কার, ও ধর্ম্ম সাধনের প্রধান সহায়, যে জাতি বিবাহ দীক্ষায় দীক্ষিত না হইলে, সম্পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না, যে জাতির স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী, যে জাতি অবিবাহিত পুরুষকে 'গৃহী' আখ্যা প্রদান করেন না, যে জাতির বিবাহের ফল পুত্র পরলোকে পিণ্ডদাতা ও পুন্নাম-নরকত্রাতা, সেই হিন্দু জাতির পবিত্র বিবাহ কাল বশে বর্ত্তমান কালের জঘন্য অবস্থায় পরিণত দেখিয়া কোন্ সহৃদয় হিন্দুর হৃদয় ব্যথিত না হয়? কোন্ হিন্দু সন্তান ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত বিবাহ প্রণালীর শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে আমূল সংস্কার করিতে অভিলাষী না হন?

এই অভীষ্ট সংস্কার কার্য্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে; ইহাতে বিস্তর ক্লেশ ও বিস্তর ত্যাগ স্বীকারের প্রয়ো-

জন। স্বজাতির উন্নতিচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই, সম্প্রদায় মাত্রে-রই আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান বিবাহ প্রথার এক একটি দোষ দেশবাসীকে সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতে হইবে। কি রূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, ইহার কোন্ কোন্ অবৈধ ভাব তিরোহিত হইবে, তৎ সকলের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহাদিগের সমক্ষে যত্ন সহকারে ধারণ করিতে হইবে। দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে যে, বিবাহ বাণিজ্য নহে; ইহা অর্থাগমের প্রশস্ত পথ নহে। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, বিবাহের ফলাফল সুদূর ভবিষ্যদ্বংশ পর্য্যন্ত অবরোহণ করিয়া আদি পিতা মাতার গুণ-দোষ সন্তান পরম্পরাকে আশ্রয় করে। তাঁহাদিগকে বুঝা-ইতে হইবে, কেবল বিবাহ প্রথার দোষে বঙ্গীয় সমাজের সম্প্রদায়-বিশেষ অনায়াসে গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ করিতে পারেন, আবার কোনও সম্প্রদায় বা বাধ্য হইয়া চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সম্ভবতঃ সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ যাহাতে যত দূর সম্ভব সুপরিণীত হইতে পারেন, প্রত্যেক পিতা মাতা বা অভিভাবকের তাহা চেষ্টা করা অলঙ্ঘনীয় রূপে কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর এবং বিস্তীর্ণ হইতে বিস্তীর্ণতর বিবাহ সীমার অবশ্যম্ভাবী ফল কি? তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, বিবাহের গুরুত্ব কি? বিবাহের দায়িত্ব কি? তবে তাঁহারা নিজের ভ্রান্ত মত ভ্রান্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন। তবে তাঁহাদিগের প্রতীতি হইবে যে, তাঁহারা কি অনভীষ্ট পথে বিচরণ করিতেছেন, এবং তাহা হইতে কত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁহাদিগের পক্ষে প্রয়ো-জন।

মনুষ্য জীবনের মধ্যে বিবাহ যে কি রূপ মহদ্ব্যাপার, তাহা আমাদিগের দেশবাসিগণ এখনও সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া, শাস্ত্রীয় যুক্তি সমূহের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া তাঁহারা পবিত্র দাম্পত্য সুখের বিঘ্ন স্বরূপ এক মাত্র লৌকিক ব্যবহারকেই মস্তকে তুলিয়াছেন। কেবল এক ব্যবহারের উপরই সমস্ত দোষ অর্পণ করি কেন? এ দেশের লোকের বিচার বিহীন অনুকরণ-প্রিয়তাও বিস্তর অনর্থের মূল কারণ হইয়া উঠিতেছে। আপনাদিগের সাংসারিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এ দেশের অধিকাংশ লোক সম্পন্ন লোকদিগের অনুকরণ করিতে যান, এবং সেই অসঙ্গত অনুকরণই তাঁহাদিগের অনেক অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। তাই বলিতেছি, আপাততঃ অপেক্ষাকৃত সামান্য 'আই পুরাণ' প্রশ্ন সকলের সমালোচনায় ব্যস্ত না থাকিয়া দেশবাসিগণ 'বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী' রূপ গুরুতর-বিষয়ের তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করুন। গ্রন্থকার এবং সম্পাদক মহাশয়গণ সম্প্রতি রুষের সহিত ইংরাজের ভাবী যুদ্ধ ঘটনা প্রভৃতি কূট রাজনৈতিক আলোচনায় সম্যক্ ব্যাপৃত না থাকিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এই গভীর সামাজিক প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হউন। এক বৈবাহিক সংস্কারের উপরই এ দেশের সামাজিক উন্নতি প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কেননা, এক বিবাহ-বিভ্রাট ঘটাতেই এ দেশে ব্যভিচার, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ এবং অকালমৃত্যু প্রভৃতির খর স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই

অনর্থের স্রোত আরও কিছু কাল এই ভাবে ধাবিত হইলে, মাতৃভূমির যে কি রূপ ঘোর দশা-বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে।

আক্ষেপের বিষয় এই, উপস্থিত প্রস্তাব এতাদৃশ গুরুতর হইলেও স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ ইহার যথোপযুক্ত আন্দোলন করিতেছেন না। যদি চিন্তাশীল স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়গণ সকলে সম্মিলিত হইয়া এ বিষয়ের একটা সদযুক্তি স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্য মত প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে, এত দিনে যে আমরা আশাতীত কল্যাণ লাভ করিতাম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই প্রকার আন্দোলনের মঙ্গলময় ফলের আশায় প্রণোদিত হইয়াই আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম। বলা বাহুল্য, আমার এই গ্রন্থ কোনও মতেই আলোচ্য প্রস্তাবের গুরুত্বানুরূপ হয় নাই। প্রস্তাবানুরূপ গ্রন্থ লিখিতে গেলে, যে রূপ প্রণালীর ও যে রূপ আয়তনের গ্রন্থ লিখিতে হয়, তাহাতে যে রূপ সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে হয়, যে রূপ সুন্দর তর্ক যুক্তির অবতারণা করিতে হয়, মদ্রচিত পুস্তকে সে রূপ কিছুই হয় নাই। তথাপি, এই গভীর আলোচ্য বিবাহ বিষয়ে অনেক চিন্তার পর, আমি উহার যে যে অংশ সংস্কারার্হ বোধ করিয়াছি, এবং ঐ সকল অংশের সংস্কার, কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, যে সমস্ত উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি, তৎসমুদায় যথাশক্তি সাধারণ জনগণ সমীপে অসঙ্কোচে এবং মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলাম। স্বদেশের সামাজিক দুরবস্থার প্রতীকারাভিলাষী সহৃদয় বিজ্ঞ মহাশয়েরা যদি আমার পুস্তক খানি এক বার আদ্যন্ত

পাঠ করিয়া মৎ প্রদর্শিত উপায়গুলি কত দূর অভীষ্ট সংস্কা-রের উপযোগী, ইহা এক বার বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। আমার পুস্তকে এ দেশের অন্যান্য কয়েক সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রণালী সাধা-রণ ভাবে, এবং বণিক্ সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রণালী বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই, কোনও জাতির দোষ গুণ সমালোচনা যেমন সেই জাতির দ্বারা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হয়, ভিন্ন জাতির দ্বারা সে রূপ হইবার সুবিধা অল্প। বণিক্ সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথার দোষ বণিকেরা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া-ছেন ও করিতেছেন। এই জন্য, ইঁহাদিগের বিবাহের দোষগুলি এবং এতৎ সম্বন্ধীয় সংস্কারগুলি ইঁহাদিগের সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে এক রূপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদিগের দেশের লোক সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা না করিয়া সকল বিষয়েই এ দেশের ধনিগণের অনুকরণ করিতে যান। কলিকাতার অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা বণিক্ শ্রেণীতেই ধনীর সংখ্যা অধিক। সুতরাং এই শ্রেণীর বিবাহ পদ্ধতি দোষ শূন্য হইলে, ক্রমশঃ অন্যান্য শ্রেণীতেও এই সদ্দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব অস-দ্দৃষ্টান্তের ন্যায় আপনা হইতেই সাদরে অনুকৃত এবং পরিগৃহীত হইবে। বণিক্ দলের বিবাহ অপেক্ষাকৃত সবিস্তার আলোচিত হওয়ার ইহাও এক কারণ। কেবল মাত্র ধনাঢ্য বণিকেরাই সকল সম্প্রদায়-ব্যাপ্ত দূষিত বিবাহ প্রণালীর পঙ্কোদ্ধার করি-বেন, এমত নহে; সকল সম্প্রদায়েরই স্ব স্ব শ্রেণীর বিবাহ দোষ সংশোধন করিয়া অপরাপর শ্রেণীকে দৃষ্টান্ত দ্বারা উপকৃত করিতে আপনাদিগকে দায়ী বিবেচনা করা উচিত।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতা সহকারে বক্তব্য যে, আমার নিতান্ত শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত বিষয়ে যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি পুস্তকের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহ বিষয়ে আমি যে গুলি দোষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, ইনি সেই সমস্ত স্বজাতীয় দোষ সম্বন্ধে আমার সহিত এক মত হওয়ায়, অধিকতর সাহসে তৎ সমস্ত সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা এই, মৎপ্রণীত পুস্তকের

"বহূন্ দোষানপি ত্যক্ত্বা কৃত্বাল্পে চ গুণে গ্রহম্।
সম্ভাবয়ন্তু সন্তো মাং শিরস্যেষ কৃতোঽঞ্জলিঃ ॥"

কলিকাতা, রাজবাটী,
২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট;
জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৭ শকাব্দাঃ।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।

বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী।

কলিকাতা, রাজবাটী, ২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদরায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।
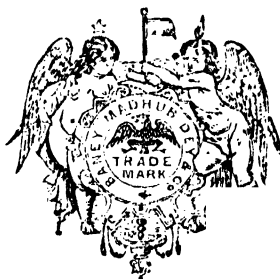
কলিকাতা

অপর চিৎপুর রোড্ শোভাবাজার ২৮৫ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮০৭ শক।